সূর্য-সারথি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৫
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
২০, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটো-টাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই - বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
তিন টাকা আট আনা

অগ্রণী কথাকার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

উপনিবেশ (তিন পর্ব)
তিমির-তীর্থ
বীতংস
ভাঙা বন্দর
দুঃশাসন
স্বর্ণসীতা
সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী
জন্মান্তর
বৈতালিক
লাল মাটি
শিলালিপি
রামমোহন

এক

বাড়িটা নিকুঞ্জ ঘোষ কিনেছিলেন যুদ্ধের হিড়িকে।

সে একটা আশ্চর্য সময়। রেঙ্গুনে জাপানী বোমা পড়েছে। তার স্প্লিন্টার অবশ্য কালাপানি পেরিয়ে হুগলী নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি —কিন্তু দানবীয় একটা আতঙ্কের বিভীষিকা এসে নেমেছে নিষ্প্রদীপ কলকাতার ওপরে। প্রতিবেশী শহর রেঙ্গুন। আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজে উঠলে চোখ বুজে সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো চলে। সেখান থেকে খোলা আকাশ বেয়ে বোমারু-বহরের কলকাতায় আসতে আর কতক্ষণ?

গড্ডলিকা প্রবাহের পেছনে তাড়া করলে নেকড়ে বাঘ।

হাওড়ায় শেয়ালদায় মানুষের উন্মত্ততা। ব্যবসা, চাকুরী, দেশসেবা, সাহিত্য, আপাতত একটি মাত্র জৈবিক তাগিদে রূপায়িত হয়েছে। বঃ পলায়তে। নিত্য নতুন গুজবের হিড়িক, পাড়ায় পাড়ায় রয়টারের নিজস্ব সংবাদদাতাদের যুদ্ধ সংবাদ পরিবেশন। ১৯৪৩ সালের অবিশ্বাস্য জনসমুদ্র এই কলকাতা, সেদিন যেন মজা নদীর চড়া। ছত্রিশ ফ্ল্যাটের শূন্য বাড়িতে দুবর নিরুপায় ভাড়াটে অসহায় ভয়ে থরহরি কম্পমান।

মেদিনীপুরে ঝি মেদিনীপুরে পলাতক, উৎকলের ঠাকুর পুরী প্যাসেঞ্জারে ওঠবার জন্যে হাইকোর্ট থেকে হাওড়া পর্যন্ত কিউ করেছে। আজমীরের আগরওয়ালা আর বোম্বাইয়ের বাটলিওয়ালা ফার্স্টক্লাশ কাউন্টারের সামনে মল্লযুদ্ধ করছে। বি এ আরের কেরানীরা পিতামহ থেকে পৌত্র পর্যন্ত পরিবৃত বিরাট সংসারের হাঁড়ি-কলসী-সিঙ্গার মেসিন নিয়ে স্টেশনের কল্পনাতীত ভিড়ে অনন্ত প্রতীক্ষায় সমাসীন। ছাপরা মজঃফরপুর লাহেরিয়া সরাইয়ের কুলি-কামিন, রিকশওয়ালা, আর গোয়ালার দল গঙ্গা পেরিয়ে

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেছে—ককেশাসের পাদমূল থেকে আদিমযাত্রী আর্য পূর্বসুরিদের মতো।

হোটেল তালাবন্ধ—চায়ের দোকান সাহারা মরুভূমির মতো নীরস আর নির্জন। বারো আনা সেরের মাছ বাজারে চার আনায় নেমেছে—কেনবার লোক নেই। টাকায় বত্রিশটা দরের ফুলকপি পচে স্তূপাকার হয়ে আছে। চীপ-মীড-ডের প্রায়-শূন্য ট্রাম গাড়ি বিষণ্ণ শীতের রৌদ্রে নিষ্প্রাণ পথের ওপর দিয়ে ঢন্‌ঢন্‌ করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়। দূর নিঃশব্দ গলির মধ্যে ওই শব্দটা যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। শুধু ছায়াচিত্রের প্রেক্ষাগারগুলো দিনান্তে এখনো কিছু পরিমাণে জনসঙ্কুল হয়ে ওঠে, প্রতি-মুহূর্তের দুঃস্বপ্নকে মানুষ এখানে ভুলে থাকতে চায় অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে, সস্তা হাসিতে, সুলভ কান্নায়।

কিন্তু সেখানেই কি নিষ্কৃতি আছে? রূপালী পর্দার ওপরে প্রথমেই দুঃস্বপ্নকে সজাগ করে দিয়ে আলোর লেখন ফুটে ওঠে: যদি সাইরেন বাজে, তাহা হইলে—

তারপরেই নিউজ রীল। আকাশে বোমারুর গর্জন, শিঁ-ই-ই—স্ক্রীমিং বোমার আর্তনাদ, তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়েছে অভ্রবিলেহী সৌধমালা। ট্যাঙ্ক, টমিগান আর রাইফেল নিয়ে হেমলেট-পরা অগণিত অমানুষিক ছায়ামূর্তি বোমা-বিধ্বস্ত প্রতীচ্যের রণাঙ্গন বেয়ে মার্চ করে চলেছে।

পথে ঘাটে দেখা হলে একটি মাত্র প্রসঙ্গ।

—কী মশাই, পালাননি এখনো?

—পালাবো আর কোথায় বলুন? থাকতেই হবে এখানে।

—নিতান্তই তাহলে মরবার ইচ্ছে হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

সম্বোধিত ব্যক্তিটি জোর করে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে। বলে, আরে মশাই, এত বড় কলকাতা। চারদিকে এত মিলিটারী টার্গেট। সে

সব ছেড়ে কি এই পটলডাঙা স্ট্রীটে আমার ঘাড়েই বোমা এসে ছিটকে পড়বে?

—তা না হয় না পড়ল। কিন্তু কন্‌সক্রীপশন হবে যে।

—কন্‌সক্রীপশন? সে আবার কী?

—কন্‌সক্রীপশন বোঝেন না? বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধে যোগদান করাবে। বেকায়দা দেখলে নিজেরা ঘটি-বাটি তুলে চম্পট দেবে ইংলিশ চ্যানেল ডিঙিয়ে আর কলকাতাকে ডিক্লেয়ার করে যাবে 'ওপন সিটী' বলে। তারপর কী হবে বলুন তো?

অপরপক্ষ নীরব।

—তারপর এসে ঢুকবে জাপানীরা। আপনারা যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছেন, সবাইকে গড়ের মাঠে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিপ্পনী কায়দায় বেয়নেট-প্র্যাকটিস্ চালাবে।

শ্রোতার মুখের ভাব অবর্ণনীয়। গলা শুকিয়ে কাঠহয়ে গেছে—হাঁটু কাঁপছে ঠকঠক করে। ক্ষীণ দুর্বল গলায় প্রশ্ন আসে: আর আপনি কী করছেন?

—আমি? আমি আজ বাড়ির সবাইকে নিয়ে দেওঘরে পাড়ি দিচ্ছি। তিন শো টাকা ঘুষ দিয়ে বার্থের ব্যবস্থা করা গেছে—আমার এক ভায়রাভাই আবার হাওড়া স্টেশনে কাজ করে কিনা।

—কিন্তু চাকরী?

—চুলোয় যাক! প্রাণে বাঁচলে অমন চাকরী ঢের মিলবে মশায়।

—দেওঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করেছেন বুঝি?

—না, এখনও কিছু হয়নি। নইলে যেখানে জায়গা হয়—গিরিডি, মধুপুর, কার্মাটার, শিমূলতলা। আর কিছুই যদি না পারি তো যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকব। বোমার ঘায়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকার চাইতে দিন কয়েক কৃচ্ছ্র-সাধন ঢের ভালো।

বক্তা একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় শ্রোতার দিকে। কিন্তু শ্রোতার মানসিক অবস্থা সিগারেট খাওয়ার মতো নয়। শুকনো গলায় শুধু জবাব দেয়, নোঃ, থ্যাঙ্কস!

ঠিক এই সময়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ওপরে বাড়িখানা কিনেছিলেন নিকুঞ্জ ঘোষ।

ঝকঝকে নতুন বাড়ি। চারতলা মিলিয়ে চব্বিশখানা ঘর, দুটো গ্যারেজ, গোটা আষ্টেক কল আর বাথরুম। পুব দক্ষিণের পথে অবাধ আলো-বাতাস। নিচে বিস্তৃত উজ্জ্বল উত্তর কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ।

বাড়ির মালিক ছিল বুড়ো ভাটিয়া। সংসারে থাকবার মধ্যে তার একমাত্র ছেলে—মস্তবড় কারবারী করাচীতে। বুড়ো চন্দনদাস কলকাতার ব্যবসা দেখা শোনা করত। হৈ চৈ হাঙ্গামার খবর পেয়ে ছেলে চিঠি লিখল: শুনছি কলকাতা নাকি বোমা পড়ে অর্ধেক উড়ে গেছে ওখানে। তাহলে আর মরবার জন্যে পড়ে আছ কেন? ঘর-বাড়ি-গদি যে দামে পাও ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসো এখানে। তোমার ছেলে কেশবদাস-চন্দনদাস বেঁচে থাকতে কোনো ভাবনা নেই।

চায়ের ব্যবসায় নিকুঞ্জ ঘোষের সঙ্গে চন্দনদাসের বিশ বছরের বন্ধুত্ব। সুতরাং বাঙলা দেশের বাড়ি বাঙালির হাতে তুলে দিয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল চন্দনদাস। নামমাত্র দামে বাড়ি কেনা হল। কিন্তু কেনাই হল, কাজে আর লাগল না। নিকুঞ্জ ঘোষ ওসম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, বোমার মুখে ও বাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, দুচার টুকরো ইট-পাথর ছাড়া ওর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। চন্দন দাস কিছু ভরসা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ভাই, তুমি যে কতখানি জিতলে তা তুমি নিজেই জানো না। যে গুজব আর হুজুগের হিড়িক আজ দেখতে

পাচ্ছ, দুদিন বাদে তার কিছুই থাকবে না। আমি যে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি তা নয়। তবে বয়স হয়ে গেছে, কলকাতার কারবার নিজে ভালো করে দেখতে পারছি না—বেদড়ক চুরি বাটপাড়ি হচ্ছে। তা ছাড়া দেশের জন্য বড় মন কাঁদছে—শেষ কটা দিন আরামেই কাটাতে চাই। তাই দোস্ত তুমি, —বাড়িটা তোমাকে দিয়েই দিলাম একরকম।

নিকুঞ্জ ঘোষ হেসে বলেছিলেন, দিয়েই যখন দিচ্ছ, তখন এ কয়টা টাকা আর হাতে করে নিচ্ছ কেন?

চন্দনদাসও হেসেছিল—শাদা শাদা বাঁধানো দাঁতগুলো বার করে ভারী স্নিগ্ধ সে হাসি। জবাব দিয়েছিল: জাত বানিয়ার বাচ্ছা আমি। বিনা দামে কাউকে কিছু দিলে আমাদের ধর্মকে অপমান করা হয়। তাই কিছু নিলাম। কিন্তু তুমি তো জানো ভাই, যে টাকা তুমি দিয়েছ, ওতে বাড়ির বরগারও দাম হয় না।

নিকুঞ্জ ঘোষ আর কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির জানতেন ও বাড়ি বোমায় উড়বেই, আর ভাঙা আবর্জনার স্তূপ বিক্রী করে সে দুর্দিনে হয়তো পঞ্চাশটা টাকাও ঘরে আসবে না। কিন্তু চন্দনদাসকে সে কথাটা বলতে মনের কোনে কোথায় যেন বাধল।

বাড়ি তো কেনা হল, এখন দেখাশোনা করে কে? একটা দারোয়ান কিংবা চাকর পাওয়া দুঃসাধ্য দাঁড়িয়েছে। নিকুঞ্জ ঘোষ গোটাকয়েক তালা মারলেন এখানে ওখানে। ওদিকে মাঝে মাঝে মহলা-সাইরেন বাজছে। তার কঁকিয়ে কান্নার মতো কাঁপা একটানা শব্দটা কানে ভালো লাগে না, মনে তো নয়ই। বড়বাজারের ভাঙা বাজার থেকে কিছু কেনা-কাটা সেরে হ্যারিসন রোডের একটা নির্জন-প্রায় হোটেলে তিনি ফিরে এলেন। দার্জিলিং মেলে ওঠবার জন্যে যখন জিনিষপত্র বাঁধছেন এমন সময় পেছনে শুনতে পেলেন লঘু পায়ের শব্দ।

বিস্মিত হয়ে নিকুঞ্জ ঘোষ পেছনে ফিরে তাকালেন।

একটি তরুণী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, ছোটখাটো চেহারা। এক হাতে প্যারাসোল, আর এক হাতে বইপত্র। বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, যে জাতীয় ব্যাগ মেয়েরা সাধারণত ব্যবহার করে না—মোটা চামড়ার স্ট্র্যাপের সঙ্গে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নিকুঞ্জ ঘোষ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এমন জায়গায় মেয়েটিকে তিনি আশা করেননি—কেউ করেও না।

বড় স্যুটকেশটার বেল্ট বাঁধা স্থগিত রইল। বললেন, আরে, এ কে? সুমিতা নয়?

—কেন কাকাবাবু, এর মধ্যে এতই কি বদলে গিয়েছি আমি? চিনতে কষ্ট হচ্ছে?

না, না—তা নয়। তারপর, ভালো আছো তো? এখানে এলেই বা কী করে?

—ভালোই আছি। আপনার এখানকার ঠিকানা বাবার চিঠিতে জেনেছিলাম। এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—ভাবলাম যদি পাই তো দেখাটা করে যাবো।

—বেশ করেছ। আজই চলে যাচ্ছি আমি, পরে এলে দেখা হত না—

নিকুঞ্জ ঘোষ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত: যাচ্ছ কবে?

—যাব? কেন?

নিকুঞ্জ ঘোষ চমকে গেলেন: কেন কী? কলকাতার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। কোন্‌দিন কী হয় ঠিক নেই। তোমার বাবা লিখেছিলেন সম্ভব হলে তোমাকে নিয়ে যেতে। আমার সঙ্গেই চলো না হয়।

—না কাকাবাবু, সে হয় না। এখন আমি যেতে পারব না।

—যেতে পারবে না? এখানে এমন কী কাজ তোমার?

সুমিতা হাসল, জবাব দিল না।

—তোমার ইউনিভার্সিটি তো বন্ধ হয়ে গেছে।—এখন এখানে থেকে আর—

—না কাকাবাবু, যাওয়ার উপায় নেই।—জলপাইগুড়িতে আপনি তো নাববেনই, বাবাকে বলে যাবেন আমার জন্যে ভয়ের কিছু নেই, আমি ঠিক আছি।

—কিন্তু একি ভালো করছ?—নিকুঞ্জ ঘোষের গলায় সন্ত্রস্ত অভিভাবকতার সুর লাগল : কোন্‌দিন যে কী হয়ে যায়—

—সেইটে দেখবার জন্যেই তো আরো থাকতে ইচ্ছে করছে : সুমিতার গলায় মধুর আবদার : যুদ্ধের খবর কাগজেই পড়লাম, চোখে কখনো কিছু দেখতে পাইনি তো। এই সুযোগে যদি পাওয়া যায়—

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন নিকুঞ্জ। কী আশ্চর্য এই এক ফোঁটা মেয়ের সাহস! বড় বড় পালোয়ান আর জাঁদরেল লোক যখন ভয়ে ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ করছে, আর পালাবার জন্যে আঁদাড় পাঁদাড় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন এই মেয়েটার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় নেই!

—বড্ড হঠকারিতা করছ মা। কখন কী হয়—

—সে ভাবনা ভাবছি না কাকাবাবু, মুস্কিল হয়েছে থাকবার জায়গা নিয়ে। হস্টেলে তো তালাবন্ধ। কোথায় যে থাকি—

নিকুঞ্জ বিমর্ষ হাসলেন : থাকার জায়গা তো যথেষ্টই আছে, কিন্তু থাকবার লোক কই! এইতো আমি এত বড় বাড়িটা কিনলাম, এখন সেটাকে তালা দিয়ে ফেলে যেতে হচ্ছে!

—আমাকেই থাকতে দিননা—সুমিতাও হাসল।

কিন্তু নিকুঞ্জ হাসলেন না।

চট করে কথাটা মনে ধরেছে তাঁর। মেয়েটা তো বেপরোয়া, বোমাই

পড়ুক আর যাই পড়ুক এখান থেকে নড়বে না! তা হলে তাঁর অত বড় বাড়িটাই বা এমন রক্ষকহীনভাবে অনাথ হয়ে পড়ে থাকে কেন? সুমিতা বরাবরই চালাক আর চটপটে মেয়ে, সে সবদিকই মোটামুটি বজায় রাখতে পারবে। বললেন, তুই ছেলেমানুষ, জাহাজের মতো অতবড় একলা বাড়িটায় থাকবি কী করে? ভয়েই মরে যাবি।

এবার সুমিতাও সচেতন হয়ে উঠল। কথাটাকে লঘুভাবে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু এইবারে সত্যি সত্যিই গুরুত্ব এসে গেল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল দলের ছন্নছাড়া অবস্থার কথা, থাকার জায়গার অসুবিধে, নানা বিড়ম্বনা। এই সুযোগে—

সুমিতার স্বরে এবার উৎসাহ এসে গেল।

—একা থাকব কেন? আমাদের হস্টেলের আরো কুড়ি পঁচিশটি মেয়ে আমার মতো এমনি অসুবিধেয় পড়েছে। যদি বাড়িটা পাই চমৎকার মেস্ করে থাকতে পারব আমরা।

—শুধু মেয়েরা মিলে থাকবে! এই দুঃসময়ে?

—আজকালকার মেয়েরা বদলেছে কাকাবাবু। নিজের পায়ে জোর দিয়ে তারা দাঁড়াতে শিখেছে।

—হুঁ?—নিকুঞ্জ ঘোষ খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটাই কেমন ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে আমার। মাত্র কটি মেয়েতে মিলে অত বড় বাড়িতে একা-একা থাকবে—

—সেসব ঠিক করে নেব কাকাবাবু, আপনি ভাববেন না।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক বলছি। যদি কোনো অসুবিধে হয়: সুমিতা স্নিগ্ধভাবে হাসল: আপনি তো রইলেনই, চিঠি দিয়ে খবর দেব আপনাকে।

নিকুঞ্জ ঘোষ তবু খানিকক্ষণ দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর

বললেন, আচ্ছা বেশ, তবে চলো আমার সঙ্গে। বাড়িটা তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিই। কপালে যা আছে তাই হবে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন নিকুঞ্জ। এত বড় বাড়ি—একেবারে রাজপ্রাসাদ—নিছক দৈবের হাতেই তুলে দিয়ে যাচ্ছেন। তবু যদি কোনোমতে রক্ষা পায়, তা হলে হয়তো এই মেয়েগুলোই এর দরজা জানালা কবাটগুলো সামলে রাখতে পারবে।

সুমিতার দিকে একবার ক্ষুব্ধ চোখে তাকালেন তিনি: আমার সঙ্গে চলে এলেই বোধ হয় ভালো করতে!

—কে জানে কী ভালো হচ্ছে—চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে সুমিতা তাঁর পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকুঞ্জ তাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানালেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

ঘুষ দিয়ে টিকেট আগেই কেনা আছে, এখান থেকে দু পা শেয়ালদা অবধি যেতে রিক্শ ভাড়া নিলে দু টাকা। পথ দিয়ে বন্যার মতো ধারায় চলেছে ভয়ার্ত মানুষের শোভাযাত্রা। ঠিক শোভাযাত্রা নয়, শবযাত্রা। ছেদহীন ট্রাফিকে পলাতকদের বহু আশার গৃহস্থালীর সরঞ্জাম—অনেক শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগানের কাঁসার জিনিসপত্র থেকে শুরু করে পায়া উঁচু করা ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত। সেই মহামানবের স্রোতে নিকুঞ্জ ঘোষও মিশে গেলেন, আপাতত এ যাত্রা বোধ হয় রক্ষাই পেয়ে গেলেন জাপানী বোমার হাত থেকে। দার্জিলিং মেল ছাড়তে সাড়ে চারঘণ্টা দেরী আছে এখনো।

সেদিকে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল সুমিতা। তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে চাবির গোছাটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

পৃথিবীটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষের মন—পলায়নী ছাড়া আর শাশ্বত সমস্ত বৃত্তিগুলোই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে এক সঙ্গে। তাই সুমিতাকে দেখে কেউ হাঁ করে তাকিয়ে রইল না, কেউ শিস দিলে না, আলগাভাবে কেউ একটুখানি ধাক্কাও দিয়ে গেল না ওকে। যুগান্তর ঘটছে যেন চারদিকে—পৃথিবীতে সত্য যুগ এবারে নেমে আসবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

চারদিকে টুকরো টুকরো উত্তেজিত আলোচনা। একই আলোচনা।

—ওদের আর কিছু নেই, এবারে ডুবল বলে—

—স্ক্যাণ্ডার্সে যে মারটা খেল, দেখলেন না?

—শুনেছেন, হাওড়া ব্রীজের ওপারে স্টেশনের দিকে আর এগোনো যাচ্ছে না—

—অদ্ভুত জাত বটে, এই জাপানীরা। কী কাণ্ডটাই না করলে সিঙ্গাপুরে। এই বেঁটে ব্যাটারাই দুনিয়ায় কীর্তি রাখলে দাদা!

—তাড়াতাড়ি চল্ বাবা রিক্‌শ, নইলে ঢাকা মেলে নাক গলাবারও উপায় থাকবে না যে। না হয় আরো কিছু বকশিস দেব—

সেই পুরোনো ভয়, পুরোনো যুদ্ধের খবর। অসুস্থ, অসংলগ্ন কলকাতা। সমস্ত শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার ওপরে ছেদের একটা আকস্মিক সীমারেখা নেমেছে এসে। হঠাৎ ভয় পেয়ে জ্বরে পড়লে যেমন হয়, তেমনি ভূতগ্রস্ত বিকারের রোগীর মতো দুটো ভয়াতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে কলকাতা প্রলাপ বকছে।

—টেলিগ্রাম—টেলি—গ্রা—আ—ম্ আ—ম—

—কী বাবা, আবার নতুন কী খবর?

—এই কাগজওয়ালা!

—এদিকে এসো তো একবার ভগ্নদূত, স্বর্ণলঙ্কার কোন দেউটিটি আবার নিভল দেখা যাক—

—টেলিগ্রা—ম্—ম্—বাবু, লড়াইয়ের জোর খবর, দু পয়সা—

—Fall of—অ্যাঁ! Successful retreat—তাই নাকি! এ যাবৎ তো ওই ওস্তাদিটুকুই দেখিয়ে আসছ সোনার চাঁদেরা। আরো কিছু পারলে তো বেঁচে যেতাম।

—না মশাই, অত সহজে হবে না। এ যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট্‌রা এবারে মরবেই, তাই শেষ দশায় পিঁপড়ের পাখা উঠেছে।

—হুঁ, পাখা যে কাদের উঠেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

মাথার ওপর দিয়ে আর-এ-এফ এর বিমান উড়ে গেল। জনতার মধ্যে জয়ধ্বনি, নানা রকমের টীকা-টিপ্পনী।

—যাওনা বাপু, জাপানে গিয়ে গোটা কয়েক ডিম পেড়ে এসো গে।

—অত সস্তা নয়, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট দাঁত খিচিয়ে আছে সেখানে।

—আমেন জনি, হ্যারি, টমি! তোমাদের বারোটা তো বেজেছে। এখন প্রার্থনা করি আত্মাগুলো শান্তিলাভ করুক। আমেন—আমেন।

পরম দুঃখের মধ্যেও রসিকতা করতে পারে বাঙালি। জাতটার আর কিছু না থাক, এই বৈশিষ্ট্যটুকু যে এখনো বজায় আছে—এটা মনে করেই যেন সুমিতা আশ্বাস পেল খানিকটা।

চলতে চলতে একটা ওষুধের দোকানের সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বড় দোকান, কিন্তু এখন তার শোভা বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না। শো-কেস্‌গুলোতে যে সব শিশি-বোতল-প্যাকেট সাজানো আছে, তারা যেন কেমন একটা অসহায় করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো শুধু দোকানের ফাঁপা অলঙ্কার—ভেতরে সারবস্তু বিশেষ কিছু নেই। কাচের গায়ে কাগজের আর কাপড়ের অসংখ্য পটি আঁটা—বোমার ঝাঁকুনির প্রতিষেধক।

কয়েক মিনিট কিছু একটা ভেবে নিলে সুমিতা। রাস্তার উদ্দাম জনযাত্রা

পায়ের ওপরে প্রায় নদীর স্রোতের মতো এসে পড়ছে। এভদ্রলোকের কি দাঁড়াবারও জায়গা হবে শেয়ালদা স্টেশনে?

একটু ইতস্তত করে সুমিতা ওষুধের দোকানে ঢুকল।

কাউণ্টারে লোকজন নেই। শুধু এক পাশে বুড়োমতন একজন ভদ্রলোক বসে খাতায় কী হিসেব লিখছিলেন। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার কালোছায়া।

—কী চাই মা?

—একটু ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?

—নিশ্চয়।

ফোন তুলে নিয়ে সুমিতা একটা খবরের কাগজের অফিসকে ডাকলে।

আদিত্য অফিসেই ছিল, পাওয়া গেল তাকে।

—কী খবর সুমি?

—খবর আছে—খুব ভালো খবর।

—চটপট বলে ফেলো।

—এত তাড়াতাড়ি নয়। তোমাকে আসতে হবে।

—এখুনি?

—এখুনি।

—অসম্ভব। এখন রয়টারের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করছি আমরা। গান পয়েন্ট আগলে বসে আছি, নড়বার জো নেই।

—চালাকি নয়। আধঘণ্টার মধ্যে আসা চাই—মণিদির ওখানে।

—এক ঘণ্টা সময় দাও তবে।

—আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এক সেকেণ্ড ওদিকে নয়।

—তাই তো, মুস্কিল! আচ্ছা—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টা নয়—অবশ্য অবশ্য। নইলে তুমিই ঠকবে, আমার কী!

—আচ্ছা।

ফোনটা রেখে সুমিতা এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। ব্যাগ থেকে তিন আনা পয়সা টেবিলে রেখে বললে, ধন্যবাদ—নমস্কার।

দুশ্চিন্তা-বিবর্ণ ভদ্রলোক খাতা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, নমস্কার।

সুমিতা আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

দুই

মণিকাদি'র আস্তানা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে—নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারের পাশেই।

বাড়িটা পুরোনো। চূণ-সুরকির আস্তর ঝরে গিয়ে সারা গায়ে যেন অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে বাড়িওলা চুপ করে বসে আছে, অনেক আবেদনেও কোনো ফল হয়নি। তারই মাঝখানে মণিকাদির ঝকঝকে সাইনবোর্ডটা কেমন বিচিত্র আর বেমানান লাগে দেখতে।

বাইরের চেহারা যত বিবর্ণই হোক—ভেতরের ব্যাপারটা অত খারাপ নয়। পুরোনো বাড়ির পুরোনো ঘরকেই যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করেছে মণিকা। একা মানুষের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশিই সে রোজকার করে। তাই দেওয়ালের শাদা চূণকামের ভেতর দিয়ে কতকগুলো বিশ্রী আর খয়েরী রঙের দাগ এলোমেলোভাবে ফুটে বেরুলেও মণিকার সাজানোর গুণে সেগুলোকে যেন তেমন পীড়াদায়ক বলে মনে হয় না।

ইচ্ছে করলে অবশ্য বাড বদলাতে পারত মণিকা—যে কোনো সুন্দর নতুন বাড়িতে সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারত। কিন্তু বাড়ি বদলানো সম্পর্কে তার ভয়ঙ্কর আলসেমি আছে। মন্দ কী—এই তো বেশ। তা ছাড়া দশ বছর আগ যখন প্র্যাকটিস্ জমে ওঠেনি, তালি দেওয়া জুতো আর সেলাই করা কাপড পরে যখন তাকে কলকাতার রাস্তায় পথ কাটাতে হত, তখন থেকেই এই বাড়িটার সঙ্গে অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি তার জড়িত। তাই এর ওপরে কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে মণিকার।

মোটা মানুষ—মনের দিক থেকেও ভারী শান্ত আর নস্তিমিত। কোনো

রকম হাঙ্গামা-হট্টগোলটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। তাই যেমন বিশ্রী লাগছিল, তেমনি একটা তীব্র বিরক্তি বোধ হচ্ছিল মণিকার। এতদিন পরে সত্যিই কি বাড়ি বদলাতে হবে নাকি? শুধু বাড়ি নয়—ছেড়ে যেতে হবে কলকাতাকে? একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তাকুল চোখে মণিকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সামনে নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। স্কোয়ার নয়—স্কোয়ারের একটা নকল একমুঠো সংস্করণ। ধুলোভরা খানিকটা বিবর্ণ জমির চারপাশে সযত্নে লোহার রেলিং দেওয়া। মাঝে তিন চারটে লোহার বেঞ্চি পড়ে আছে, তাদের চেহারাও সমান বিবর্ণ এবং বয়োজীর্ণ। সব চাইতে উপভোগ্য নানাবিধ নিষেধ সম্বলিত কর্পোরেশনের সুদীর্ঘ লিপিখানা: ফুল "ছিঁড়িলে আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" এক গোছা মরা ঘাস থাকলেও কথা ছিল—তাতে অন্তত দু চারটে ঘাসের ফুল ফুটতে পারত।

চারপাশের বাড়ি অনেকগুলোই এর মধ্যে তালা বন্ধ। যারা বন্ধ নয়, তাদের সামনে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি আর রিক্শার ভিড় জমেছে, উঠেছে স্তূপাকার মালপত্র। ছারপোকা আর ধুলোয় ভরা পুরোনো জাজিম থেকে কানাভাঙা ফুলকাটা কুঁজো পর্যন্ত। যাচ্ছে তো সব, কিন্তু মানুষ যাবে কী করে?

সামনে দু তিনটে ডাস্টবিনে শতাব্দী-সঞ্চিত আবর্জনা। ক'দিন ধরে ধাঙ্গড়ের দেখা নেই, তারা বোধ হয় রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিতে দিতে এতক্ষণে মোকামা ঘাটে গিয়ে পৌঁছুল। স্কোয়ারের এদিকের রাস্তায় লোকজন নেই —শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় কতকগুলো শুকনো কলাপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে, কোনো শেষ মহ্ফিলের স্মারক চিহ্ন বোধ হয়। থেকে থেকে ভেসে আসছিল ডাস্টবিনের পচা গন্ধের এক একটা উত্তাল তরঙ্গ।

বাইরে খুট খুট করে হালকা জুতোর শব্দ। দরজা ঠেলে সুমিতার

প্রবেশ। কাঁধের ব্যাগটা ঝুপ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললে বাবা, হাঁপিয়ে গেছি।

অসাড় জড় মনটা যেন খানিক পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠল মণিকার। যেন আশ্রয় পেল, অশ্বাস পেল।

—তারপর, কোন্ লঙ্কা জয় করে এলি?

—অনেক। মীর্জাপুর, কলেজ স্ট্রীট, বেনেটোলা, হ্যারিসন রোড—

—থাম্ থাম্। দিনরাত কেন এই টো টো কোম্পানির ম্যানেজারী করে বেড়াচ্ছিস বলতে পারিস?

—আমি তো আর তোমার মতো মোটা নই যে, জড়ভরত হয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকব।

—চুপ কর সুমি, মোটা বলবি না।

—আচ্ছা বলব না—সুমিতা হাসল: কিন্তু একটু চা খাওয়াতে হবে মণিকাদি। একেবারে বেদম হয়ে গেছি।

—চা পাবে? তা হলে তৈরী করে নাওগে।

—কেন, তোমার খসরু কোথায় গেল?

—খসরু?—মণিকাদি ভ্রূভঙ্গি করলে: সে এখন ভৃত্য নয়, রাজপুত্র। তাই দিল্লীর তখ্‌তে-তাউস অধিকার করবার জন্যে দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠতে গেছে।

—যাক, বাঁচিয়েছে।—অত্যন্ত খুশি হয়ে সুমিতা হেসে উঠল। ইজি-চেয়ারটাতে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল মণিকা: কী যে হাসছিস সুমি, ভালো লাগে না। আমি অনাথ হয়ে পড়ে আছি, তোর হাসি পাচ্ছে কী করে?

—অনাথ! আহা হা, কী দুঃখের কথা। কেন সময়মতো একটি গোলগাল পতিকে ইহ-পরকালের সিংহাসনে বসিয়ে সনাথ হওনি মণিকাদি? তা হলে তো এখন এমন বিলাপ করতে হত না। অন্তত এই দুঃসময়ে এক পেয়ালা চা করে সে খাওয়াতে পারত।

—আমাকে চটাসনি সুমি, মার খাবি।

—নাঃ মণিকাদি, তুমি একেবারে হোপলেস।

সুমিতা উঠে দাঁড়ালো।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—যাবো আবার কোথায়? একটু চা তৈরীর চেষ্টাই করা যাক। তোমার খসরু বাদশাই হোক আর বাদশাজাদাই হোক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখন এক পেয়ালা চা না পেলে নির্ঘাৎ মরে যাবো।

অসহায় নৈরাশ্যের একটা করুণ নিশ্বাস ফেলল মণিকা। পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, দু পেয়ালা করিস।

সুমিতা ভেতরে চলে গেল, আর ইজি চেয়ারটায় তেমনি করে ঠেসান দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল মণিকা। ফাঁকা হয়ে আসা কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই; নিজেকে আত্মস্থ করে রাখবার কেন্দ্রীয় বিন্দু নেই কোনো। একটা পীতাভ কুয়াশার মতো জমাট অবসাদে সমস্ত চৈতন্য যেন মূর্ছিত হয়ে আছে।

পার্কের পাশ দিয়ে এক একটা করে বোঝাই গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা খোলা ফিটনে একটি বউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর পা-দানীতে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মুছছেন একজন ভদ্রলোক—নিশ্চয় স্বামী। যে বোমার দিন আসছে, তাতে স্বামীর সঙ্গে ফিরে দেখা হবে কি না কে জানে।

মাথার ওপরে বায়ু-তরঙ্গে সাইক্লোন। এরোপ্লেন উড়ে গেল, চারদিকের এই অশুভ আয়োজনটাকে আরো বেশি পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেল যেন। মণিকার কেমন বিশ্রী অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল সেও পালিয়ে যায় এখান থেকে—পালিয়ে যায় কোনো দূরের আশ্রয়ে। এই ভীতির বাইরে—এই পুঞ্জিত আতঙ্কের নেপথ্যে। কলকাতার আনন্দিত আতিশয্য

পীড়াদায়ক লাগে ; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি পীড়াদায়ক মহানগরীর এই বৈধব্য-মূর্তি।

চমক ভাঙল সুমিতার ডাকে।

—মণিকাদি, ঘুমুচ্ছো নাকি? চা নাও।

নিরুত্তরে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালা নিলে মণিকা।

—তোমার খসরুর বাহাদুরি আছে বটে। কেটলী, পেয়ালা, দুধ, চা, চিনির এমন চমৎকার বন্দোবস্ত করে রেখেছে যে তাদের এক সঙ্গে জড়ো করতে গেলে উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে হয়।

চায়ে একটা আলগা চুমুক দিয়ে মণিকা বললে, কী করা যায়, বলতো সুমি?

সুমিতা বললে, অনাথিনী হয়ে পড়েছ বুঝি? তার জন্য এত দুর্ভাবনার কী আছে? অনুমতি দাও, বারো ঘণ্টার ভেতরে নাথের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—ইয়ার্কি দিসনে। সত্যিই কী করি বলতো?

এবারে সুমিতার মুখের ওপর থেকে হাল্কা হাসির সূক্ষ্ম রেখাটা মিলিয়ে এল। নিবিষ্ট মনে চামচে দিয়ে পেয়ালাটায় নাড়তে নাড়তে জবাব দিলে, কী আবার করবে? চুপ করে বসে থাকো।

—বসে থাকব মানে? অবস্থা দেখতে পাচ্ছিস না? কলকাতা তো নয়—যেন নরককুণ্ড। এর ভেতরে পড়ে থেকে কী লাভ আছে বলতে পারিস?

—পালিয়ে গিয়েই বা কী লাভ?

—কেন? যুদ্ধের যে অবস্থা—

সুমিতা আবার হাসল।

—আচ্ছা মণিকাদি, কলকাতা যারা দখল করে নিতে পারে, ভারতবর্ষের কোথায় তারা বোমা ফেলবে না, আমাকে বলতে পারো?

মণিকা চুপ করে রইল।

—পালিয়ে কোথায় যাবে? আগুন শুধু বোমারই নয়—সারা দেশেই জ্বলছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে বেড়া আগুন। তার হাত থেকে কোথাও তুমি রেহাই পাবে না। কলকাতায় যদি না হয়, তা হলে পৃথিবীর কোন প্রান্তেই নয়।

এবারেও চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল মণিকা। কোনো কথাই আসছে না তার মুখে। শুধু টেবিলের ওপরে গোলাপী রঙের সুগন্ধি হাল্কা ধোঁয়াটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা ঠাণ্ডা হয়ে চলেছে।

মণিকার মনে হতে লাগল যেন তার সমস্ত সত্তা তলিয়ে যাচ্ছে কোনো একটা শূন্য অতলান্ত গভীরতার মধ্যে, বায়ুবাষ্পহীন জলের নীলিম অন্ধকারের ভেতরে। চোখের দৃষ্টি খোলা অথচ সে চোখে ক্রমাগত অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। কিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, বোঝাও যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে আসছে বারে বারে—নাক কানের ভেতর দিয়ে যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসবে। ঠিক এই রকম একটা অনুভূতি হয়েছিল তার ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে গিয়ে। বড় দীঘিটায় শ্যাওলা পড়া ঘাট থেকে পা পিছলে সে গভীর জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল—নীলাভ শীতল অন্ধকারের মধ্যে এমনি করেই চূড়ান্ত বিস্মৃতির ভেতরে বিলীন হয়ে আসছিল তার চেতনা।

হঠাৎ মিষ্টি করে হাসল সুমিতা।

—আচ্ছা মণিকাদি, তুমিও কাজ করো না আমাদের সঙ্গে।—চটুল কৌতুকে সুমিতার চোখ জ্বল জ্বল করতে লাগল: তোমাকে আমরা প্রেসিডেণ্ট করে দেব।

মণিকা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

—হঠাৎ?

—বাঃ—হঠাৎ কেন! তোমার মতো যোগ্য প্রেসিডেন্ট আর কোথায় পাওয়া যাবে? বেশ মানানসই চেহারা আছে—লোককে ডেকে দেখানো চলে।

—কেন, আমার কি আর মরবার জায়গা নেই?

—তোমার রোগীরা তো? তারা কি আর কলকাতায় আছে নাকি? যতদিন তাদের মারবার সুযোগ ফিরে না পাচ্ছ, ততদিন আমাদের মাথাই খাও না হয়।

—তোদের মাথায় কি আর কিছু আছে যে খাব?

বাইরে ঘটাং ঘটাং করে কড়া নড়ে উঠল।

—কে?

সাড়া নেই। তেমনি ঘট্ ঘট্ করে কড়া নাড়তে লাগল।

—আঃ, জ্বালাতন করলে। সুমি, একটু দেখে আয়তো লক্ষ্মীটি।

কিন্তু সুমিতাকে আর যেতে হল না। যে কড়া নাড়ছিল, নিজেই এসে দর্শন দিলে। মণিকা তাকিয়ে দেখলে, আদিত্য।

চেয়ারে একবার নড়ে চড়ে ওঠবার চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মণিকা: ওঃ তুমি! এক সুমিতা এসে হাড় জ্বালিয়ে মারছে, সেই সঙ্গে তুমি এসে জুটলে!

আদিত্য প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। প্রচুর শব্দ-সাড়া করে এক কোণ থেকে চেয়ারটাকে টেনে আনল আরেক প্রান্তে। তারপর আরাম করে তার ওপরে আসন নিলে। হাতে মোটা একটা চুরুট, তাই থেকে এক রাশ ধোঁয়া উড়িয়ে বললে, ছিঃ মণিকাদি, আপনি দিনের পর দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। এটা কোনো ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার রীতি নাকি?

—তোমাদের ভদ্রতার জ্বালায় আমি তো গেলাম।

—এখনি কী হয়েছে!—আদিত্য কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো দৈববাণী করতে লাগল: মাত্র আমাদের দুজনকে দেখেই আপনি

বিচলিত হয়ে পড়েছেন, কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন গোটা কলকাতাটাকেই আপনার ঘরের ভেতরে এনে জড়ো করে ফেলব।

ছোটখাটো মানুষ আদিত্য। অতিরিক্ত বই পড়ে পড়ে কেমন একটুখানি কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো বন্য এবং বিশৃঙ্খল—বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে বিরহী নায়কের মতো। কিন্তু এটা ইচ্ছাকৃত নয়—যে কোন বিদ্যা এবং বুদ্ধিজীবীর মতোই নিয়মিত চুল কাটানোর ব্যাপারে ওর যেমন আছে আতঙ্ক, তেমনি সময়াভাব। শেষ পর্যন্ত কেশভার যখন গলা ছাড়িয়ে কাঁধের সীমা ডিঙিয়ে পিঠে নেমে পড়তে চায়, সেই সময় গলির মোড় থেকে একটা উড়ে নাপিত ডেকে আনে আদিত্য—ওর ভয় হয় সেলুনের ভদ্রলোক হেয়ার কাটার ওর বন্য বর্বর চুলে কাঁচি ছোঁয়াতে রাজী হবে না।

কিন্তু চুলের বেলা যাই হোক দাড়ি সম্বন্ধে আদিত্য অত্যন্ত হুঁসিয়ার। সে দাড়ি গজায় একেবারে পাঠান সম্রাটদের মতো—শুধু চোখ দুটো বাকী রেখে মুখের সর্বত্র তাদের উদার-অভ্যুদয় ঘটে। আদিত্য গর্ব করে বলে, বহুরোমিতা আর্যত্বের লক্ষণ—এ হচ্ছে আমার এরিয়ান বিয়ার্ড। কিন্তু এরিয়ান বিয়ার্ডের আরেকটা দিকও আছে। একটু বড় হলেই তাবা একেবারে পিনের মতো ফুটতে থাকে। তাই বাধ্যতামূলক ভাবেই আদিত্যকে নিয়মিত দাড়ি কামাতে হয়।

গায়ের জামাতেও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বুক-পকেটটা কাঁধের কাছাকাছি অনেকখানি উঠে পড়েছে, অন্যান্য সেলাইগুলোও ঠিক নিয়মমাফিক পড়েনি। ওর বোন্ পিংড়ী—যার কলেজের নাম সুশ্বেতা রায়—তারই হাতের এক্সপেরিমেণ্ট এসব। সে বাড়িতে বসে নিজের হাতে টেলারিং শিখছে। বন্ধু-বান্ধবেরা ঠাট্টা করলে ভারী চমৎকার জবাব দেয় আদিত্য। বলে, বন্থ মানুষ, বানর আর গিনিপিগের প্রাণ নিয়ে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট চলে, পিংড়ীর এক্সপেরিমেণ্টের

কল্যাণে আমি না হয় পোষাকী সভ্যতাটাকেই কিছু পরিমাণে নিধন করলাম।

এ হেন আদিত্য। যেমন সপ্রতিভ, তেমনি ওরিজিন্যাল। খবরের কাগজে চাকরী করে আর অঙ্গাঙ্গীভাবে করে খানিকটা রাজনীতিও। একটা এম. এ. আর একটা এম এস-সি পাশ করে বসে আছে, যদিও দুটোর কোনোটাই বিশেষ কাজে লাগে না। তর্কের বেলায় রাজনীতির মধ্যে খানিকটা বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য মিশাল দিয়ে প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। আর তার চরিত্রের বিশেষত্ব সব চাইতে চমৎকার হয়ে ফুটে আছে তার চোখে। চোখ দুটি বড় নয়—কিন্তু আশ্চর্য নীল তাদের রঙ। বাঙলা দেশের শ্যামবর্ণ বেঁটে মানুষ আদিত্য সমুদ্র পার থেকে অমন নীলিম চোখ কী করে আমদানী করল, ওর এক জেনিটিক্‌স-বিশারদ ডাক্তার বন্ধু মাঝে মাঝে তাই নিয়ে গবেষণা করতে চেষ্টা করে।

আদিত্যের চোখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে মণিকাদি বললে, থাক, অত বিশ্বপ্রেমে দরকার নেই। আমার ঘরটা এখনো অতটা পরিমাণে সোশ্যালাইজ্‌ড হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ব্যাপার কী, একসঙ্গে মঘা-অশ্লেষা এখানে এসে জুটলে কেমন করে?

সুমিতা ভালো মানুষের মতো চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, চা খাবে আদিত্য দা? মণিকাদির খসরুর চা নয়—আমার শ্রীহস্তের তৈরী।

আদিত্য হাসল: উঁহু, মণিকাদি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। সত্যি বলছি মণিকাদি, আমার কোনো দোষ নেই। সুমিতা আমাকে টেলিফোন করেছে পত্রপাঠ আপনার এখানে চলে আসবার জন্যে।

—হুঁ।

সুমিতা বললে, সত্যি দরকারী কথা। তোমাদের দুজনকে স্তম্ভিত করে দিতে পারি এমন খবর নিয়ে এসেছি।

আদিত্য চুরুটে টান দিয়ে বললে, বটে! তা হলে বলো, অবহিত হয়ে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটা শোনা যাক।

সুমিতা গম্ভীর হয়ে বললে, শোনো। আমি এখন বিবেকানন্দ রোডে একখানা চারতলা বাড়ির একচ্ছত্র মালিক।

—তার মানে?

মণিকা এবং আদিত্যের যুগপৎ সবিস্ময় স্বর বেরুল।

—দাঁড়াও বলছি। তার আগে আর একবার চা করে আনি—নইলে আলোচনাটা ঠিক মতো জমে উঠবে না।—সমস্ত ঘরে বিস্মিত কৌতূহলের একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে সুমিতা চায়ের সন্ধানে গেল।

বাইরে বেলা ডুবে আসছিল। কলকাতার ভাঙা হাটের ওপর দিয়ে বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ে নামছিল বিকেলের রাঙা আলো। সামনের পার্কের বেঞ্চিগুলো এমন সময়েও প্রায় শূন্য পড়ে আছে—একফালি নির্বারিত আকাশ আর খোলা হাওয়ার লোভে কোনো স্বাস্থ্যান্বেষী আজ এসে আসন নেয়নি। শুধু ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট পরা অত্যন্ত মলিন চেহারার দু তিনটি ছেলে ওখানে ডাংগুলি খেলছে। নিতান্তই পথের ছেলে, তাই জীবনের দাম নেই, জীবনের ভয়ও নেই। আর, একখানা কলাপাতাকে অবলম্বন করে দুটো নেড়ী কুকুর শুরু করেছে আকাশফাটানো কলহ।

মণিকার ঘরের ভেতরে তিনটি প্রাণীর আলোচনা জমে উঠেছিল।

মণিকা বললে, অত বড় বাড়ি দিয়ে তুমি কী করতে চাও?

—বিশেষ কিছু না। অনাথ-আশ্রম খুলব।

—অনাথ-আশ্রম!

—ক্ষতি কী!—সুমিতা সকৌতুকে হেসে উঠল।

মণিকা বিরক্ত হয়ে বললে, ছাখ সুমি, ইয়ার্কীরও একটা সময় অসময় আছে। এখন ওসব ভালো লাগছে না।

—বাঃ ইয়ার্কী! অনাথ আশ্রম খুলব এর মধ্যে ইয়ার্কীর কী আছে! এতো রীতিমত মহৎ ব্যাপার! পরলোকে কাজ দেবে।

মণিকা বললে, খুব তো আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। দুদিন পরেই যখন ঘাড়ের ওপর বোমা পড়বে, তখন টের পাবি। তখন কোথায় যাবে অনাথ, কোথায় থাকবে কী!

আদিত্য জানালার বাইরে নীল চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলে অনেকক্ষণ ধরে কী একটা পর্যবেক্ষণ করছিল। এইবারে বেশ আরাম করে খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে বললে, আশ্রমে অনাথের অভাব হবে বলছেন মণিকাদি? কিন্তু আপনি তো জানেন না কত অসহায় নাবালক এই মুহূর্তেই আশ্রমে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তার মানে?

—দাঁড়ান দেখছি—চেয়ার ছেড়ে চট করে উঠে পড়ল আদিত্য। দ্রুত-গতিতে বেরিয়ে এল বাইরে। পার্কের এদিকের কোণায় একটা লাল বাড়ির রোয়াকে একটি ভদ্র সন্তান গোঁফের পরিচর্যা করতে করতে বিড়ি টানছিল, আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে সিনেমার গানের কলি গুঞ্জন করছিল। আদিত্যকে ঘাড় নিচু করে বুলডগের মতো তার দিকে আসতে দেখে গুঁফো লোকটির হঠাৎ কী একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ-গতিতে উঠেই সে জোর পা চালিয়ে দিলে নরসিং লেনের দিকে।

পাথরের মতো কঠিন মুখ নিয়ে আদিত্য ফিরে এল। নীল চোখে আর প্রসন্ন কৌতুক নেই, আগুনের স্ফুলিঙ্গ চমক দিয়ে উঠেছে।

—কী হল আদিত্যদা?

—টিকটিকি।

—সে কি!—মণিকা সভয়ে বললে, এখানে কেন?

—ওয়াচ করছিল আমাদের।

—কী সর্বনাশ !

সুমিতা হাসল, কিন্তু আদিত্যের নীল চোখে স্ফুলিঙ্গ উঠল শিখা হয়ে।

—এরা ভেবেছে কী ! এমনি করে শানানো ঠোঁট নিয়ে বসে থাকবে আর ছোঁ মারবে ! জীবন যে দুর্বহ করে তুলল !

কেউ আদিত্যের কথার জবাব দিল না।

আদিত্যে বাইরের দিকে তাকিয়ে দু চোখের আগুন বৃষ্টি করে চলল। তার সমস্ত চেহারাটাই বদলে গিয়ে মুহূর্তেঃ নাঃ, আর সহ্য হয় না। এর একটা উপায় করতেই হবে। বন্দুক ছোঁড়াটা ভুলেই গিয়েছিলাম তিরিশ সালের পরে—এবার শকুন শিকার আবার প্র্যাকটিস্ করতে হবে।

মণিকাদি বললে, শকুন শিকার !

মেঘের মতো গলায় আদিত্য জবাব দিলে, হাঁ, শকুন বই কি। শুধু শকুন নয়—কাক-চিল থেকে শুরু করে ডোরাকাটা বাঘ পর্যন্ত। খবরের কাগজ উড়িয়ে অনেককাল কাটল, এবারে দেখা যাক তার চাইতে বেশি কিছু করা যায় কি না।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুমিতার দৃষ্টি—আর মণিকা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। আদিত্যের কথাটা সে ঠিক যে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত অনুভব করেছে। জঙ্গলের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে আসা শিকারীর বন্দুকের নল থেকে বুনো হাঁস যেমন বারুদের গন্ধ পেয়ে সজাগ ও চকিত হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে মণিকার মনও যেন একটা সুনিশ্চিত আসন্নতায় শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বাইরে সাইকেলের শব্দ। ডাক শোনা গেল, আদিত্যবাবু আছেন এখানে ?

—কে ?—আত্মসংবরণ করে সাড়া দিলে আদিত্য।

—আমি মথুর, অফিস থেকে আসছি। একটা চিঠি আছে আপনার।

আদিত্যের আফিসের ছোকরা বেয়ারা মথুর। খামে আঁটা একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। বললে, এক ভদ্রলোক অফিসে এসে এটা দিয়ে গেলেন। বললেন, খুব জরুরী, এক্ষুণি এটা আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে।

চিঠি দিয়ে মথুর চলে গেল।

ক্ষিপ্র হাতে খাম খুললে আদিত্য। কালো মুখের ওপর কালো কালো রেখা দেখা দিল এক রাশি। হাত কাঁপতে লাগল।

—সুমিতা, অনিমেষের খবর।

ব্যাকুল উৎসুক ভাবে সুমিতা এগিয়ে এল: কী খবর অনিমেষের?

—ভালো নয়। বাগানের ভেতরে সাহেব তাকে এমন ভাবে মেরেছে যে, বাঁচবে কিনা বলা শক্ত। সমস্ত অবস্থা প্রতিকূলে।

মণিকা বললে, কী ভয়ানক! আমাদের অনিমেষকে!

—হ্যাঁ, অনিমেষকে। শোনো সুমি, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। আমি এক্ষুণি আফিসে যাচ্ছি ছুটির জন্যে—যত ভিড় হোক না কেন, সাড়ে দশটার ট্রেন আমি ধরবই। চারতলা বড় বাড়িটা আপাতত তোমার চার্জেই রইল, যা হয় কোরো তুমি।

সুমিতা অস্ফুট স্বরে বললে, তোমাকেই যেতে হবে আদিত্যদা?

—হ্যাঁ, আমাকেই। চিঠিতে সেটাই বিশেষ করে লিখেছে। আর যতদূর মনে হচ্ছে আমি না গেলে ভালো করে সব ব্যবস্থাও করা যাবে না।

—কিন্তু—

—আর কিন্তু নেই সুমি। আমি এখুনি সকলের সঙ্গে কথা বলে ম্যানেজ করে নিচ্ছি। আর ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে কাছাকাছি আর সকলের সঙ্গে কমিউনিকেট করে নিতে হবে। যা মনে হচ্ছে যখন তখন ওরা অনিমেষকে মেরে ফেলতে পারে। শহরে গিয়ে কাউকে খবর দেওয়া যাচ্ছে না —Practically his life is at their mercy! আচ্ছা, আমি চললাম—

ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল আদিত্য—এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না।

আর এতক্ষণে ভাবান্তর দেখা গেল সুমিতার মুখে। মনিকাদির চোখে পড়ল তার গালের ওপর থেকে রক্ত সরে সরে সমস্ত মুখটাই কাগজের মতো বর্ণহীন আর শাদা হয়ে যাচ্ছে।

তিন

এদিককার ছোট গাড়ি যে ছোট লাইন দিয়ে আসে, তার দু পাশেই আলোর গতিকে স্তব্ধ সংহত করে ঘন নিবিড় জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে।

সে জঙ্গল শালের। মাঝে মাঝে দুচারটে অন্য গাছও আছে। নিঃসঙ্গ নিভৃত দু-একটি দেবদারু শালবনের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে নিজের রাজকীয় মর্যাদাকে তেমন করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি; পলাশ-শিমূলের যে রাঙা ফুলের মঞ্জরী পাহাড়ী ঝোরার পাশে রূপের আগুন জ্বালিয়ে জেগে আছে, এক বুনো জানোয়ার ছাড়া সে সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার দৃষ্টি নেই কারো। শুধু মাঝে মাঝে ভীরু ভীরু পা ফেলে হরিণের পাল আসে, শিমূলের ফুল খেয়ে খুশি হয়, দেবদারুর ছায়ায় পরস্পরের গা চাটে আর ভয় পেলে শুকনো শালের পাতায় মর্মরিত পদশব্দ তুলে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

তা ছাড়া, শাল, শাল, আর শাল। রেল লাইনের দুপাশে, মন্দিরের মতো উঠে পাতার আবরণে যেন ঢেকে দিয়েছে আকাশকে। তবু লাইন যে দিকে সোজা চলে গেছে—সেদিক অনাবরণ দিগন্তের একটা মুক্ত রূপ চোখে পড়ে। মুক্ত রূপ, কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ওখানে আকাশের সীমা টেনে দিয়েছে হিমালয়ের মহিমান্বিত অপূর্ব সুন্দর গিরিশৃঙ্গ—তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এক বর্ষাকালে যখন মেঘের পর মেঘের কালো দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওদিকটাকে দৃষ্টির দুরধিগম্য করে রাখে সেই সময় ছাড়া—বছরের আর সব সময়েই এই রেল লাইনে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ মূর্তিখানা দেখা যায়। ভোরের আলো যখন শালবনের অন্ধকারকে স্বচ্ছ-তরল করে দিতে পারে না, শুধু ঝোরার জল একটা আসন্ন আশায় ঝিকিয়ে ওঠে—তারও বহু আগে আকাশের এক প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙে। পেন্সিলে আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে

ছবির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায়। তারপর অরণ্যের কোনো এক প্রান্তরেখায় দেখা দেন সূর্য-সারথি, আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। এই শালবন ছাড়িয়ে আরো বহু বিস্তীর্ণ বাংলা দেশ, সেই বাংলা দেশের আরো সুদূর কোন্ এক সীমান্তে কলকাতার আকাশ অরুণরাগে রাঙিয়ে ওঠবার আগেই কাঞ্চনজঙ্ঘা তার দীপ্তিতে রঙিন হয়ে ওঠে। শাদা তুষারের ওপর দিয়ে যেন রক্তের ধারা গলে গলে পড়তে থাকে। শালবনের মধ্যে সূর্যের আলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ক্রমশ উজ্জ্বল আর প্রখর হয়ে ওঠে। আবার বেলা ডোবে, দুপুরের রৌদ্র শাণিত তীক্ষ্ণ তুষার সোনার রঙ মাখে,—দেখতে দেখতে সে রঙ ছাপিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে যায়। প্রাচী থেকে পরিক্রমা সুরু করে প্রতীচির অস্ত দিগন্তে সূর্য-সারথি তার যাত্রা শেষ করে—কাঞ্চন-জঙ্ঘার ধোঁয়াটে ছায়ামূর্তি একটা বিশাল প্রেত-ছবির মতো নিঃসীম অন্ধকারের নেপথ্যে তলিয়ে যায়।

সারাদিন—সারারাত, কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো অবগুণ্ঠিত এই পর্বত শিখরের ছায়ার নিচে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্র গর্জন করে চলে। বাঘের ডাক তলিয়ে যায় তার ভেতরে, তলিয়ে যায় শাল-পলাশের ডালে ডালে ময়ূরের কেকাধ্বনি। শালবনের ওপরে নির্মল নীল আকাশে চিমনির ধোঁয়া উঠতে থাকে।

চা-বাগান।

ঢালু মাটি। চারদিকে অরণ্যের পরিবেশ। বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে চলে, চা-বাগানের বড় বড় নালা বেয়ে নেমে যায় পাহাড়ী নদীতে। চায়ের পক্ষে আদর্শ দেশ।

শালবনের মধ্যে পত্তনি করে, আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় অনেকগুলি চায়ের বাগান গড়ে উঠেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, সমস্ত পৃথিবীময় খ্যাতি লাভ করেছে এই তথাকথিত ভারতীয় চা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চমৎকার

পীচের রাস্তা, বাগানের ইন্‌স্‌পেক্‌শন বাংলোতে একেবারে রাজপ্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য। সস্তা ডিম, দুধ, মাংস আর সস্তা মানুষের পরিশ্রম। অপ্রতিহত প্রতাপে সাম্রাজ্যভোগ করবার এমন সুযোগ অন্যত্র দুর্লভ। তাই বুনো জানোয়ারের আর কালাজ্বরের ভয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই অর্থলোভী মানুষ এখানে ডেরা বেঁধেছে।

এই স্বনামধন্য ভারতীয় চা আর সেই সঙ্গে কাঠের ব্যবসার জন্যেই এই রেল লাইন। দুপাশে শালবন আর দিগন্তে কাঞ্চন-জঙ্ঘা। পাহাড়ে বুনো জানোয়ারের ডাক। ঘাসবনের মধ্যে অজগর-কবলিত দাঁতাল-শূয়োরের আর্তনাদ। আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে মসৃণ, মোটরের তেলে চকচকে পীচের রাস্তা। রেলের ওয়াগনে আর লরীতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয়ের সহজ রপ্তানি।

এইখানে একটা সাহেবী চা-বাগানে মাস তিনেক আগে বাবু হয়ে এসেছিল অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুজন ইংরেজ এই বাগানের মালিক। একজন লিয়োপোল্‌ড, আর একজন রবার্টস। লিয়োপোল্‌ড বড সাহেব, ইয়োরোপীয়ান প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন হর্তাকর্তা-বিধাতা। সে শহরেই থাকে, নিতান্ত দরকার না পড়লে বাগানের দিকে পা বাড়ায় না; আর এখানকার সব কিছু দেখাশোনা করে ছোট সাহেব রবার্টস—দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জেনারেল ম্যানেজার। মস্ত বড় বাংলো, ফুলের বাগান, বিলিতী কুকুর, ঘোড়া আর দু'দুটো বন্দুক। যেন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে উপনিবেশ বসিয়ে সেখানে রাজত্ব করে যাচ্ছে।

আদর্শ ইংরেজ রবার্টস। নিজের শিরাস্নায়ুতে যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে নর্ডিক রক্তের নীল-প্রবাহ। মাথার চুলগুলো উগ্র তামাটে রঙের। মোটা নাকে পরিস্ফীত রক্তাক্ত শিরার জাল-বিস্তার। হাতের রাইডারটা

বড় ঘোড়াটাকে মায়া করে চলে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার অনুকম্পা নেই। কুলির পিলে-ফাটানো বীর জাতির উপযুক্ত বংশধর।

অনিমেষ যখন চাকরীর দরবারে এল, সাহেব তখন হাফ-প্যাণ্টের পকেটে দুহাত পুরে নতুন ডায়নামোটাকে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিল। কাল এটাতে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে গেছে। একটা কুলির একখানা হাত বেল্‌টটা সম্পূর্ণভাবে টেনে নিয়েছিল—বহুভাগ্যে লোকটা প্রাণে মরেনি। কুলিরা বলেছে বিপজ্জনক, ওটাতে কাজ করতে তারা ভরসা পাচ্ছে না। ভ্রূকুঞ্চিত করে রবার্টস ভাবছিল, কী করা যায়!

এমন সময় অনিমেষ এসে সেলাম দিলে।

ঠোঁটের পাশে পাইপ কামড়ে ধরে, মোটা নাক আর কপিশ চোখ দুটোকে এক সঙ্গে জড়ো করে রবার্টস জিজ্ঞাসা করলে, কী চাই বাবু?

—একটা চাকরী!

—ও:।—রবার্টসের চোখে দুটো মিট মিট করতে লাগল: বাগানে কাজ করেছ কখনো?

—না।

—টেস্‌টিমোনিয়াল আছে?

—না।

—চায়ের কাজ কিছু বোঝো?

—কিছু না।

রবার্টসের চোখ তেমনি মিট মিট করতে লাগল: তা হলে আমি নিরুপায়। বাগানে অভিজ্ঞ লোকই আমাদের দরকার।

অনিমেষ বললে, মাপ করবেন স্যার। কাজ করবার সুযোগই যদি না পাব, তা হলে অভিজ্ঞতা আসবে কোত্থেকে। আপনি আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখুন।

—তা বটে। কথাটা রবার্টসের মনে লাগল। পাইপের ধোঁয়া ছড়িয়ে

কী ভেবে নিলে মিনিট কয়েক। বললে, আচ্ছা, বিকেলে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। আই লাইক ইয়োর আউটস্পোকেন্‌নেস।

বিকেলে অনিমেষের চাকরী হয়ে গেল। কিন্তু রবার্টস জানতনা কোন্ গৃহশত্রুকে সে ঘরে এনে ঢোকাল।

একটা আশ্চর্ষ দেশ এই চা-বাগান। কবে চীন দেশের মাটি থেকে এই বস্তুটি ভারতবর্ষের বুকে এসে শিকড় গেড়েছে তা এখন অতীত ইতিহাসের আড়ালে হারিয়ে গেছে। কিন্তু একে কেন্দ্র করে আজ গড়ে উঠেছে নতুন কালের নতুন ইতিহাস।

ভারতীয় চা! ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যেখানে যাও—এই ভারতীয় চা তার রাজমর্যাদা নিয়ে শোভা পাচ্ছে। বড় বড় শহরের ইন্দ্র-পুরীর মতো সাজানো হোটেলে, নিউইয়র্ক, চিকাগোর একশোতলা বাড়ির ঘরে ঘরে কেকোনাট গ্রোভের স্বপ্নচ্ছায়ায় এই ভারতীয় চা তার গন্ধের যাদুমন্ত্র বিস্তার করে আছে। এক পেয়ালা চা সামনে রেখে চলেছে কোটি কোটি টাকার লেনদেন, এক পেয়ালা চায়ের সোনালি আমেজে হ্যারি আর হ্যারিয়েটের চোখে বিহ্বলতা আসছে ঘনিয়ে, এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে চুরুটের ধোঁয়া মিশে ঘুরিয়ে চলেছে সারা দুনিয়ার রাজনীতির চাকা। ভারতীয় চা! বিজ্ঞাপনে লেখা হয়ঃ অতুলনীয়।

ডুয়ার্স আর টেরাইয়ের জঙ্গল কেটে পত্তনি বানিয়ে, হিমালয়ের বুকে পাথর কেটে থরে থরে সাজিয়ে এই চায়ের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। ইংরেজ সাহেবেরা শতকরা নব্বইটি বাগানের মালিক। রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্যে গড়া তাদের বাংলোগুলো—বিলাসে, প্রাচুর্যে ভারতীয় চায়ের মতোই অতুলনীয়। তেজী বিলিতী কুকুরগুলো পর্যন্ত অতিরিক্ত মাংস আর মাখন খেয়ে ভোঁতা আর থলথলে হয়ে গেছে, ভালো করে ছুটতে পারে না, সাহেবদের মতোই কেমন অবরুদ্ধ গলায় তারা গাঁক গাঁক করে ডাকে।

আর ঠিক সেই সময় পিঠে শিশু বেঁধে প্লাকিং করে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর-বিশীর্ণ কুলি মেয়েরা। হাণ্টার হাতে সুপারভাইজার দাঁড়িয়ে থাকে বিকৃত মুখে, প্লাকিংয়ে বিন্দুমাত্র ভুল করলে মারের চোটে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে রক্তারক্তি করে দেবে। বারোটার বাঁশী বাজলে যখন প্ল্যাকিংয়ের ওজন হয়, তখন দেখা যায়, এত পরিশ্রম, এত শাসনের পরেও পেটপুরে দুবেলা খাবার মতো সংস্থানও ওরা করতে পারেনি।

চায়ের পাতা ড্রায়িং-এ মেলে দেওয়া হয়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে আসে ওদের স্বাস্থ্য, জীবন; গ্রাইণ্ডিং মেশিন শুধু চায়ের পাতা পিষে তার সবুজ নির্যাসটাই নিষ্কাশিত করে দেয়না, সেই সঙ্গে নিংড়ে নিংড়ে নিতে থাকে ওদের রক্ত। আর সেই রক্তে রঙ ধরে পিকো, অরেঞ্জ পিকো, পিকো ফ্যানিংস। ভারতীয় চার স্বাদ-গন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ, বিস্মিত করে দেয়।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাক্ওয়াটার ফিভার। কুলি লাইনে কান্নার উচ্ছ্বাসটাও তেমন জোর বাঁধেনা, আর কাঁদবার মতো উৎসাহও নেই কারুর। চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্‌সারীর ওষুধ বাইরে বিক্রী করে দিয়ে, ম্যানেজারের সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ার ব্যবস্থা করে নিয়ে, প্রাইভেট্ প্র্যাকটিসের ক্ষোভটা মেটায় ডাক্তার। বাবুরা বেগার খাটায়, সস্তায় কেনে দুধ, কেনে হাঁস-মুরগীর ডিম, খায় পাঁটা। দুমকা থেকে, সাঁওতাল পরগণা থেকে, মানভূম থেকে ওরা আসে মাদল নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে। কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই এখানকার অলক্ষ্য বিষক্রিয়া ওদের রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তখন ওদের কোনো আলাদা জাত থাকে না, কোনো আলাদা ব্যক্তিসত্তাও না। সব এক রকম—সব এক জাতের। ওরা চা-বাগানের কুলি।

কিন্তু পৃথিবীটা ভারী খারাপ জায়গা। দু চারজন ভদ্রলোক যারা ভালো খেয়ে দেয়ে ভালো করে বাঁচতে চায়, তাদের শক্র অনেক। কারুর সুখ অন্যে সইতে পারেনা। তাই ওখানে ধর্মঘট, এখানে বিক্ষোভ, সেখানে রুটির

লড়াই। অবশ্য বন্দুক-কামানের কারখানা যতক্ষণ হাতে আছ, আছে হাতে টাকার তোড়া, ততক্ষণ ওজন্যে ভাববার *বিশেষ কিছু নেই।* তবুও মাঝে ভারী বিরক্তি বোধ হয়, একশো ডলারের এক একটা ডিনার খেতে বসে যখন ওই রুটির চীৎকার কানে আসে, তখন দুশো বছরের পুরোনো মদের নেশাটাও কেমন ফিকে মেরে যায়। খাঁটি হীরের নেকলেস্‌টাকে আঙুলে লীলাভরে জড়াতে জড়াতে ভ্রুভঙ্গি করে লেডীরা বলেন, মাই গড্‌, কী বিশ্রী চীৎকার করে লোকগুলো!

কিন্তু লোকগুলো নির্বোধ। ওরা ফরাসী বিদ্রোহকে ভুলতে পারেনা, ভুলতে পারেনা মে-দিবসের রক্তকে, ভুলতে পারেনা অক্টোবর বিপ্লবের ইতিহাসকে। বাস্তিল্‌ ওদের হাতছানি দেয়, শীতে-কুয়াশায় বুভুক্ষু বিক্ষুব্ধ জনতার উইণ্টার-প্যালেস্‌ বিধ্বস্ত করবার কাহিনী ওদের রক্তে রক্তে গর্জন করে ওঠে। সোনালি চায়ের বাটিটা দূরে সরিয়ে রাখেন রাষ্ট্রনেতা, বিরক্তিভরে চুরুটটাকে ছুঁড়ে দেন ছাইদানীতে। হ্যাট্‌ জার্মান জু! হি হাজ্‌ স্পয়েল্‌ট দিস্‌ হ্যাপি ওয়ার্লড্‌!

চা বাগানের সাহেবেরা একটু বেশি তৎপর আর বুদ্ধিমান। ই, টি, পি, এ—ইয়োরোপীয়ান টী প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোশিয়েশন এ বিষয়ে হিতোপদেশের নীতি মেনে আসছে বরাবর। প্রিভেন্‌শন ইজ বেটার দ্যান কিয়োর। বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখলেই আগে থেকে তার গলাটা টিপে ঠাণ্ডা করে দাও। একটুখানি অসন্তোষের আভাস যখনি চোখে পড়বে সেই মুহূর্তেই করে ফেলবে অমোঘ ব্যবস্থা: হটাবাহার! সোজা ঘাড় ধরে বাগান থেকে বের করে দেবে।

অসুবিধে বিশেষ কিছুই নেই। বাগানগুলো একেবারে দুর্গের মতো নিরাপদ। পাহাড়-জঙ্গলের দুর্গম দেশে হাজার হাজার একারেজের প্ল্যাণ্টেশন। কোথাও লুকিয়ে চুরিয়ে থেকে এখানে এসে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবে

সে পথ বন্ধ। কুলি-লাইনের ওপর সব সময় জেগে আছে শকুনের মতো সজাগ আর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সন্দেহজনক কোনো কিছুর আভাস পেলেই পত্রপাঠ তার মূলশুদ্ধ উৎপাটন করে দেওয়া হবে। এতকাল এই-ই চলছিল এবং বেশ ভালোই যে চলছিল বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

যেন সমুদ্রের মাঝখানে নিরাপদ দ্বীপের দুর্গ। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, টাইফুন পাক খেয়ে যায়; কিন্তু এখানকার শব্দরোধক প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে তার গর্জন পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে আসে। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত নেই—এ এক আশ্চর্য আকাশপুরী।

কিন্তু হালে রবার্টসের মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

চা-বাগানের ভেতরে মাঝে মাঝে যেমন এক আধটা বাঘের উৎপাত ঘটে, মানুষ গোরু মহিষকে দুটো চারটে থাবা বসিয়ে যায় তারা, তেমনি কিছুদিন ধরে দু একটা বাগানে দুটো একটা লাল ঝাণ্ডার লোক ধরা পড়েছে। প্রহারে জর্জরিত করে তাদের বিদায় করা হয়েছে, নিরিবিলিতে জঙ্গলের মধ্যে একটাকে সাবাড়ও করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু! ছাট্ আন্‌হোলি ব্যাক্‌টিরিয়া অব সোশ্যালিজ্‌ম্! সহজে মরবার পাত্র নয়, অলক্ষ্যে বংশ বিস্তার করতে করতে একদিন এপিডেমিকে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

তা ছাড়া—

একা বসে মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে রবার্টসের মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে যায় অ্যালান পোর একটা অমানুষিক গল্প: দ্য রেড্ ডেথ। পাহাড়ের গুহার ভেতর নিরাপদ নির্বিঘ্ন আশ্রয় রচনা করেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি। নিশ্চিন্তে যখন উৎসবের দিনগুলো কেটে চলেছে নাচে, গানে আর মদের পাত্রের তরলতায়, তখন কোথা থেকে নিঃশব্দে এসে ঢুকেছে মৃত্যু—ঢুকেছে রেড্ ডেথ্—মুহূর্তে সব কিছু তলিয়ে গেছে নিরুপায় সর্বনাশের মধ্যে।

তাই সব সময় কড়া নজর রাখতে হয়েছে চারদিকে। একটু ভুলের জন্যে সব বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে, বাঁধের গায়ে এক ইঞ্চি ফাটল ধরলে তাই দিয়ে ঢুকতে পারে প্লাবন।

সে যাই হোক, এমনি করে সুখে দুঃখে নেহাৎ মন্দ কাটছিল না দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎ এলো পৃথিবীজোড়া বিপর্যয়।

হিট্‌লার! ছাট্‌ ডেভিল্‌ অব্‌ ডেভিল্‌স! তোজো! দ্য ইয়েলো ডেমোন! ড্যান্‌জিগ্‌কে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়া নাড়া খেয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে বদলে গেল সব কিছু। ইয়োরোপে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার আগুন আস্তে আস্তে শিখা বিস্তার করতে লাগল এশিয়ার প্রান্তে প্রান্তে। খবরের কাগজ খুলে রবার্টসের চোখে পড়তে লাগল দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। চায়ের ব্যবসায় মন্দা—ইউরোপে শিপ্‌মেণ্ট যাচ্ছে না—প্লাইউডের বাক্স ভর্তি চা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে খিদিরপুরের ডকে। বাকী ছিল আমেরিকা, জাপানী-যুদ্ধের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত জলের তলাতেও দেখা দিতে লাগল ইউ-বোট আর টর্পেডো—ও পথও বন্ধ হয়ে গেল।

শুধু এ হলেও দুঃখ ছিল না। খবরের কাগজগুলো যে-সব বার্তা বহন করে আনে, বেতারের ঘোষক প্রতিদিন গম্ভীর কণ্ঠে যে ঘোষণা করে, তার কোনোটাই আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার মতো নয়। সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী যে সাম্রাজ্যের আকাশ থেকে কখনো সূর্য অস্ত যেতো না—তার সেই সূর্যের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে করাল রাহু। শুধু গেল-গেল ডুবল-ডুবল, বোমায় চুরমার হয়ে গেল সমস্ত।

অপমানে, দুশ্চিন্তায় রাত্রে রবার্টস ঘুমোতে পারে না। অসহায় আক্রোশে নিজের হাত দুটোকে তার কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এ কী হচ্ছে, এ কী হল? হিংস্র বিদ্বেষে রবার্টস নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়ায় বুনো জানোয়ারের মতো। খেতে বসলে খেতে পারে না, মাঝে মাঝে মনে

হয় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে পারলে যেন সে বাঁচে। বুকের ভেতরে থেকে থেকে আর্তনাদ ওঠে : গেল, গেল,সব গেল!

মেজাজ যেমন তিরিক্ষি, তেমনি বিকট হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় কুলিদের ওপর হাত চলে; অকারণে লাথি মারে কুকুরদুটোকে; কোনো জার্মানকে বা জাপানীকে হাতের কাছে পায় না বলেই কাক-চিল-শকুন যা পায় তারই ওপরে গুলি চালাতে চেষ্টা করে। রবার্টস নিজেই যেন ভয়ানক একটা বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে।

কিছুতেই মন শান্তি পায় না। শেষ পর্যন্ত দুকাঁধে দুটো রাইফেল নিয়ে রবার্টস জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। শিকার করবে।

দুর্ভাগ্য যেদিন আসে সেদিন সেটা সব দিক থেকেই আসে। সারাদিন শালবনের মধ্যে ঘুরেও কিছু মিলল না। বড় শিকার তো দূরের কথা, দু-একটা হরিণও চোখে পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে গেল নক্ষত্রবেগে। কাঁটায় হাঁটু ছিঁড়ে গেল, কাঁধ টনটন করতে লাগল রাইফেলের ভারে। নিজের ঠোঁটটাকে কামড়াতে কামড়াতে রবার্টস উঠে এল রেল লাইনে, হাঁটতে শুরু করে দিলে বাগানের দিকে।

সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দিনান্তে তার চূড়ো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রবার্টসের চোখে জল এল। এমনি করেই কি অস্তে নামছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যও? ওই রক্ত কি ইংলিশ চ্যানেলে, ফ্ল্যাণ্ডার্সে আর সিঙ্গাপুরে অমনি করে ছড়িয়ে গেছে?

নিচ দিয়ে পীচের একটা রাস্তা চলে গেছে বাগানের দিকে। রবার্টস দেখল বাগানের একটা কুলি-সর্দার সেই পথ দিয়ে সাইকেলে করে চলেছে। লোকটা নতুন, খুব কাজের লোক।

কিন্তু আশ্চর্য, সাহেবকে দেখেও লোকটা সাইকেল থেকে নামল না বা সেলাম দিল না। কয়েক মুহূর্ত ঘটনাটা যেন বিশ্বাস করতেই পারল না

রবার্টস। এতবড় দুঃসাহস তার বাগানের একটা কুলির কেমন করে হতে পারল যে, এতদিনের বাঁধা নিয়মকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বীরের মতো সে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল!

জঙ্গলের ভেতর ঘুরবার সময় প্রাণভরে হুইস্কি গিলেছিল রবার্টস। এতক্ষণে দেহের মধ্যে অ্যালকোহলের সেই আগুন যেন সক্রিয় হয়ে উঠল। বাজের মতো গলায় রবার্টস ডাকলে, এই শূয়ারকা বাচ্চা!

সাইকেল তখন পীচের রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু কটু গালটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নক্ষত্রবেগে নেমে পড়ল। বললে, কেন গাল দিচ্ছ সাহেব?

স্পর্ধা! কপিশ চোখ দিয়ে মাংসাশী ক্ষুধা যেন ঠিকরে বেরোতে লাগল। কেন সে গাল দিচ্ছে তারও কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে এই কুলি-সর্দারটাকে? ইংরেজ কি যুদ্ধে সত্যি সত্যিই হেরে গেছে নাকি যে এর মধ্যেই এই ব্ল্যাক্-সোয়াইনেরা যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করেছে?

—সেলাম দিতে জানোনা শালা শূয়োর?

—খবর্দার, গাল দিয়োনা সাহেব। তুমি যাচ্ছ লাইন দিয়ে, আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। খামাকো তোমাকে সেলাম ঠুকতে যাবো কেন? মদ গিলেছ, ঘরে গিয়ে পড়ে থাকো যাও। রাস্তায় মাতলামি করে মরছ কেন?

রবার্টস থরথর করে কাঁপতে লাগল। এর পরে আর কোনো কথা আসছে না, আসা সম্ভবও নয়। মিনিটখানেক কুলিটার দিকে তাকিয়ে থেকে রবার্টস বললে, ইউ এণ্টার মাই গার্ডেন এগেইন অ্যাণ্ড আই উইল শুট্ ইউ।

—যাও, যাও।—একটা ব্যঙ্গাত্মক মুখভঙ্গি করলে কুলি-সর্দার: গুলি করা অত সস্তা নয়। পয়সা লাগে। অনেক সেলাম তো পেয়েছ, এবার চুপ করে বসে থাকো গে। অত নবাবী আর চলবে না।

রবার্টস পিঠের রাইফেলে হাত দিলে। সত্যি সত্যিই লোকটাকে গুলি করবে কিনা ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে দেখলে সাইকেলটা বাঁক ঘুরে শালবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হেঁটে নয়, যেন জলন্ত একটা হাউয়ের মতো বাগানে উড়ে এল রবার্টস। একটা কুলি-সর্দারের এত সাহস হওয়া সম্ভব নয়—এর পেছনে কোনো ভদ্রবাবুর ইঙ্গিত নিশ্চয় আছে। এতকাল এই চায়ের বাগানে সপ্তদশ শতাব্দীর ধরণে রাজত্ব চলে এসেছে—সাহেবের সামনে দিয়ে কেউ ছাতা মাথায় চলতে পারে নি, ঘোড়া বা সাইকেলে করে যেতে পারেনি। সাহেবকে যারা দেবতার চাইতেও বড় করে দেখে এসেছে—তাদের এতখানি আস্পর্ধা দিলে কে? কে সেই শয়তান?

কোয়ার্টারে ফিরে রবার্টস গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। দেন্ দ্য রেড্ ডেথ হ্যাজ্ কাম! শুধু রাগই নয়, আতঙ্কে সমস্ত শরীরটা চমক খেয়ে উঠল রবার্টসের। নাউ অর নেভার। একেই যুদ্ধ একটা সর্বব্যাপী সর্বনাশের সংকেত বয়ে এসেছে, তারপর এ যদি বাড়তে পায়, ইউ স্ট্যাণ্ড্ নো হোয়ার! হুইস্কির ক্রিয়াটা ততক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছে। না—রাগে আগুন হয়ে ঝটপট একটা কিছু করে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একটা কুলিসর্দারের কথায় রাগ করে কোনো লাভ নেই, ঝাড়ে-মূলে একে উচ্ছন্ন করতে হবে।

রবার্টস বাগানের ডাক্তার যাদব ঘোষালকে খবর দিলে।

গুটি গুটি পায়ে এল যাদব ডাক্তার। প্রথম জীবনে শহরে কোথায় কম্পাউণ্ডারী করে হাত পাকিয়েছিল, সেই যোগ্যতায় চা বাগানের সুযোগ্য সিভিল সার্জেন হয়ে উঠেছে। কিন্তু যোগ্যতা হিসেবে সেইটাই তার বড় পরিচয় নয়। সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক সে—হুইস্কির একটুখানি তলানি বকশিস পেলেই বাগানের অনেক গোপন খবর সে

সাহেবের কানে তুলে দেয়। অনেকটা তারই বিশ্বস্ততার গুণে বাগানের জীবনযাত্রা এতকাল নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এসেছে।

এক পেগ পেটে পড়তেই যাদব ডাক্তারের মুখ খুলে গেল। বললে, অনেকদিন ধরেই বলব বলব করছিলাম, কিন্তু হুজুরের যে মনের অবস্থা দেখেছি, সেই জন্যেই—

সবটা শুনে রবার্টস চুপ করে রইল। ভুল হয়েছে, অত্যন্ত কাঁচা কাজ করে ফেলেছে একটা। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ যখন তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে বিকল করে ফেলেছিল, সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে, তার অনবধানতাকে আশ্রয় করে বাগানে ঢুকেছে রেড্ ডেথ্! অজ্ঞাতকুলশীলকে চাকরী দেবার এই পরিণাম। কিন্তু এখনো খুব বেশি দেরী হয়নি। অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে হবে এবং করতে হবে এমন চূড়ান্তভাবে যে নিগারগুলো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! পাইপের গোড়াটা খানিকক্ষণ চিবিয়ে নিয়ে রবার্টস বললে, আচ্ছা তুমি যাও ডাক্তার, আমি দেখছি।

পরদিন সকালে কুলিদের কোলাহলে রবার্টসের ঘুম ভাঙল। সমস্ত বাগানে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ফ্যাক্টরীর বাঁশি বেজেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বাগানে একটি লোক কাজ করতে যায় নি, একটি লোকও হাত দেয়নি। ম্যানেজারের কোয়ার্টারের সামনে এসে হট্টগোল শুরু করে দিয়েছে তারা।

চাবুক হাতে করে রবার্টস্ নেমে এল।

—কী ব্যাপার?

—আমাদের মজুরী বাড়াতে হবে।

—কেন?

—যুদ্ধের বাজারে ঢের খরচ, পোষাচ্ছে না!

—বটে?

রবার্টসের জীবনে এ আর একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ধর্মঘটের খবর সে কাগজে পড়েছে, পড়েছে শ্রমিক বিক্ষোভের বিবরণ। কিন্তু সে-সব শহরের ব্যাপার, তার সম্পর্ক বড় বড় ফ্যাক্টরীর সঙ্গে। সেখানে বাইরে থেকে উত্তেজনা জোগাবার মতো লোকের অভাব হয় না—সেখানে আছে শিক্ষা, আছে খবরের কাগজ। কিন্তু এই চা-বাগানে, হিমালয়ের ছায়ার নিচে দূর দুর্গম এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের ভেতরে যে সে-আগুনের স্ফুলিঙ্গ কখনো উড়ে আসতে পারে, তা রবার্টসের ধারণাও ছিল না। কালাজ্বরে জীর্ণ নির্বোধ সাঁওতাল আর ভয়ত্রস্ত ওঁরাওঁয়ের দল—যাদের সঙ্গে না আছে শিক্ষার সংস্রব না পৃথিবীর, এমন করে দাবী জানতে তাদের শেখালে কে? এই ভয়ে রবার্টস্ বাগানের ইস্কুলে কুলির ছেলের ভালো করে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ দেয় না, সন্দেহজনক কোনো বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় না বাগানের ত্রিসীমানার ভেতরে। কিন্তু আজকে—

জার্মানী আর জাপানের প্রতি সঞ্চিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠল রক্তের মধ্যে।

—বাড়তি মজুরী চাও, বটে?—খাড়া খাড়া চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ল রবার্টসের: দিচ্ছি বাড়তি মজুরী। তোমাদের ব্যানার্জিবাবুকে ডাকো তো একবার। তার সঙ্গেই কথা কইব।

কুলিরা কিছু বুঝতে পারল না। আনন্দিত কোলাহল করে তারা অনিমেষকে ডেকে নিয়ে এল। তাদের দাবী পূরণ হবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

সাহেবের আহ্বানে অনিমেষ সামনে এসে দাঁড়ালো। বুক সোজা করেই দাঁড়ালো। রবার্টসের চোখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পেরেছে এ সাক্ষাৎ সুখের বা আনন্দের নয়। কিন্তু এই ভেবে তখনো তার বিস্ময় লাগছিল যে সে এর ভেতরে যে আছে এ খবর রবার্টসকে কে দিলে?

রবার্টস বললে, ভেতরে এসো আমার সঙ্গে।—তারপর কুলিদের দিকে

ফিরে বললে, তোমরা যাও—কাজ করোগে। আমার যা কথাবার্তা আমি ব্যানার্জি বাবুর সঙ্গেই বলব।

দুজনে সাহেবের ঘরে ঢুকতেই সাহেব ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর দুজনে দাঁড়ালো পরস্পরের মুখোমুখি।

—এই লোকগুলোকে তুমি আস্কারা দিয়েছ? —বজ্রগর্ভস্বরে জিজ্ঞাসা করলে রবার্টস।

আত্মগোপন করবার উপায় নেই, চেষ্টা করে লাভও নেই। প্রশান্তকণ্ঠে অনিমেষ বললে, আস্কারা আমি দিইনি। শুধু নিজের দাবীটা ওদের জানাতে বলে দিয়েছি মাত্র।

—দেন ইউ আর দ্যাট্ ন্যাস্টি রেড!—সাহেব হুঙ্কার করল: আমি তোমাকে শেষবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি। ওই ডার্টি নিগারগুলোকে বলে এসো আমার সঙ্গে ও সব চালাকি চলবেনা।

—আমার যা বলবার সে আমি ওদের বলেছি। এবার তোমার যা বলবার আছে বলতে পারো তুমি।

—হোয়াট!—রবার্টসের মুখ ঘাতকের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল: তার মানে তুমি ওদের বলতে রাজী নও?

—না।

—হটাবাহার! আই সে, গেট্ আউট্ ফ্রম মাই গার্ডেন।

—ওদের দাবী আদায় না করে বাগান থেকে আমি যাবনা।

স্পর্ধার চরম! রবার্টস্ ক্রোধে বিদীর্ণ হয়ে পড়ল: ইউ মীন স্ট্রাইক?

—স্ট্রাইক আমরা চাইনা, দাবী মেটাতে চাই।

—হটাবাহার। গেট্ আউট্—

অকম্পিত স্বরে অনিমেষ বললে, না, আমি যাবনা।

অসহ্য ক্রোধে সাহেবের চোখের সামনে যেন পৃথিবীটা ঘুরতে লাগল।

মনে পড়ল সেই কুলিটার কথা যে সাইকেল থেকে নেমে তাকে সেলাম জানায়নি, মনে পড়ল একটু আগেই মজুরী বাড়াবার দাবিতে কুলিরা তার বাংলোর সামনে এসে হল্লা জুড়ে দিয়েছিল।

দ্য রেড ডেথ্। অনিমেষের ছদ্মবেশ ধরে সে যেন রবার্টসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে পৃথিবী টলছে মহাযুদ্ধের বিস্ফোরণে, এদিকে, পায়ের তলায় এরা মাটির বনিয়াদ আলগা করে দিচ্ছে। আর উপায় নেই—নাউ অর নেভার!

—যাবেনা?

—না।

—চাপরাশী।—ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল রবার্টস।

আধ ঘণ্টা পরে যা ঘটল তার জন্যে বাগানের কেউ প্রস্তুত ছিল না।

চাবুক আর রোলারের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত অনিমেষের অচেতন দেহটা সাহেবের চাপরাশীরা বাইরে টেনে নিয়ে এল। পেছনে পেছনে এল রবার্টস। তার এক হাতে রাইফেল উদ্যত হয়ে আছে।

বাঘের মতো গর্জন করে রবার্টস বললে, এই রাস্কেলকে বাগানের সীমানার বাইরে টেনে ফেলে দাও। আর শুনে রাখো সকলে, আমার রাইফেলের মুখেই বাড়তি মজুরীর ব্যবস্থা করেছি, যাদের দরকার থাকে এসে নিয়ে যেতে পারো।

ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত বাগানটা থমথম করতে লাগল। আর এরই কয়েকদিন পরে নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারে মণিকাদির বাড়িতে বসে মথুরের মারফৎ খবরটা পেল আদিত্য।

প্রশস্ত চারতলা বাড়িটার মালিক সুমিতা। শুধু মালিক নয়—একচ্ছত্র মালিক।

নিচ দিয়ে উত্তর কলকাতার দীর্ঘ বিস্তীর্ণ রাজপথ। যুদ্ধের দুর্যোগ নেমেছে চারদিকে—তবু এ পথটায় ট্রাফিকের মন্দা পড়েনি। ছেদহীন গাড়ির সারি চলেছে, চলেছ মানুষ, অথচ বেশ বোঝা যায় কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, কোথায় যেন ঘটে গেছে ছন্দোপতন। শীতের রৌদ্রে যেন একতান মিলিয়েছে একটা অনাসক্ত ঔদাসীন্য—প্রয়োজনের তাগিদ নেই, কাজের অহেতুক বিড়ম্বনা নেই, একটা বৈরাগ্যের ইন্দ্রজালে কলকাতার সমস্ত স্নায়ুগুলো শিথিল আর নিঃসাড় হয়ে গেছে। শুধু কান পেতে আছে কখন বেজে উঠবে সাইরেনের প্রতিনীকণ্ঠ, আকাশে দেখা দেবে নিপ্পনী বিমানের বিভীষিকা, তারপর—

তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুমিতা অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে ছিল নিচের দিকে। শীতের রোদে চাঁপা ফুলের রঙ, উত্তুরে বাতাসে অল্প অল্প ধুলো উড়ছে। সামনে কতগুলো দোকান খোলা—কয়েকটাতে কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলছে। তেতলা চারতলার বারান্দায় আর কাপড় শুকোচ্ছে না, বোমার ভয়ে সব একতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। টাকার পাখায় উড়ে যারা আকাশের সগোত্র হয়ে উঠেছিল, তারা হঠাৎ কঠিন মাটির অতিশয় কাছাকাছি নেমে এসেছে—পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে বাধ্যতামূলক সাম্যবাদ।

এতবড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। এখানে ওখানে ঢুকছে বাইরের অনধিকারী বাতাস, কোথায় যেন জানলার একটা পাল্লাকে নিয়ে ক্রমাগত আছড়া-আছড়ি করছে। চব্বিশখানা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে আর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে সুমিতার। বিচিত্র একটা অনুভূতিতে সমস্ত মনটা কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে—যেন কলকাতায় নয়, কোথায় কোন্ একটা নির্জন দ্বীপে কে ওকে নির্বাসন দিয়ে গেছে।

তিনদিন হল হঠাৎ ঝড়ের মতো চলে গেছে আদিত্যদা। সেই থেকে আর কোনো খবর নেই। কোথায় ডুয়ার্সের চা-বাগান,—ঘন শালের বন,

দিক-চক্রবালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেখানে অনিমেষ থাকে, সেইখানে চলে গেছে আদিত্য। তারপর আদিত্যের কোনো খবর নেই, অনিমেষেরও না।

একদিন ছিল, যখন অনিমেষের খবরই সব-চাইতে বেশি দরকারী ছিল সুমিতার জীবনে। কিন্তু সেদিন আর নেই—সব বদলে গেছে। নিজের হাতেই একদিন সব-কিছুর ওপরে সীমারেখা টেনে দিয়েছে অনিমেষ। যা হতে যাচ্ছিল, তা হল না। কোনোদিন আর হওয়া সম্ভব নয়। যেদিন মনে হল, বসবার ঘরের এই চায়ের পেয়ালা, হাতের কাছে এই দিশি-বিলিতী কবিতার বইগুলো,—নিঅনের বর্ণচ্ছটায় সিনেমার ইন্দ্রপুরী, গড়ের মাঠের ঠাণ্ডা অন্ধকারে মিষ্টি আইসক্রীম আর মিষ্টি ভালোবাসা, এরা শুধু নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা—সেদিন থেকে সব কিছুর অর্থই বদলে গেল।

তখন নামজাদা একটা মিশনারী কলেজে পড়াশুনা করত ওরা দুজনে। অনিমেষ ছিল কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। যথানিয়মে একদিন গোলমাল বাধল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। দুপক্ষেরই জেদ ছিল সমান—ছাত্রেরা এক পা নড়তে চাইল না—প্রিন্সিপ্যালও নয়। ফলে স্ট্রাইক এবং হাঙ্গার স্ট্রাইক—উত্তেজনা কলকাতার সব কলেজগুলোতে ছড়াতে লাগল প্রবল দাবাগ্নির মতো। তারপরে দেখা দিল পুলিশ।

সুমিতা বি-এ পাশ করল, কিন্তু অনিমেষ করল না। কলেজ থেকে আগেই তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকেই দুজনের পথ এক হয়ে গেল। যে অনিমেষ সুমিতাকে অনার্স পড়াত, সেই অনিমেষই তাকে পড়াতে লাগল রাজনীতির বই। আগে দেখা হত লেকের ধারে, এখন দেখা হতে লাগল বস্তিতে বস্তিতে, সভাসমিতিতে আর রাজনৈতিক আলোচনার চক্রে।

আশ্চর্য, কী হতে গিয়ে কী হয়ে গেল! নিতান্ত সৌখীন মানুষ ছিল অনিমেষ। কবিতা ভালোবাসত, ভালোবাসত, থর্নি স্মিথের ফ্যান্টাসী।

আদ্দির পাঞ্জাবী গিলে করত, চশমার ভেতর দিয়ে তাকাত উদাস দৃষ্টিতে—যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে না পাওয়া প্রিয়ার বিবাহ সে ব্যাকুল হয়ে আছে। পেছন থেকে একটি মেয়ের বিনুনী নজরে পড়লে তার মুখখানা দেখবার জন্যে এক মাইল রাস্তা হেঁটে যেতেও তার আপত্তি ছিল না। আউটরাম ঘাট বুফেতে বসে গঙ্গার বুকে জ্যোৎস্না দেখে তার মরে যেতে ইচ্ছে করত, ইচ্ছে করত মরে গিয়ে সে ম্যাগ্নোলিয়া হয়ে উঠবে। গরম চায়ে সে চুমুক দিতে রাজী হত না —ভয় পেতো পাছে তার ঠোঁটদুটো মোমের মতো গলে যায়। অর্থাৎ দেহে-মনে-প্রাণে পরিপূর্ণ অ্যাডোনিস্ হবার সে স্বপ্ন দেখত—তার পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার আলো আর রজনীগন্ধার গন্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে কোনো মেয়ের সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে প্রেমে পড়বার জন্য সে তৈরী হয়েই ছিল, সুতরাং সামান্য পরিচয়ের সূত্রেই সুমিতাকে সম্পূর্ণ করে হৃদয় ঢেলে দিতে তার দেরী হয়নি।

বাহ্যিক ন্যাকামী অবশ্য যথেষ্ট ছিল অনিমেষের—তবু সুমিতার তাকে নিতান্ত মন্দ লাগেনি। মানুষটা সরল, মন একেবারেই অপরিণত। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকলেও বর্বরতা ছিল না। প্রেমিক মানুষ, সুমিতাকে যখন ভালোবাসবার সুযোগ পেল তখন নিঃশেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল, নিজের মনের মধ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল, আর ছন্দ মেলাতে না পেরে দিস্তা দিস্তা কাগজে গাদায় গাদায় গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করলে।

বেশ চলছিল—শেষ পর্যন্ত হয়তো চলতও এমনি করেই। তারপর সুমিতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত, তারও পরে বাপের পশার নিয়ে অ্যাডভোকেট হয়ে কালো গাউন গায়ে চড়িয়ে হাইকোর্টে গিয়ে 'মি লর্ড' বলে সওয়াল করত অনিমেষ। সেদিন কাব্য ল রিপোর্টের নিচে চাপা পড়ত, আদ্দির পাঞ্জাবী গিলে করবার সময় পাওয়া যেত না। উচ্চবিত্ত বাঙালি ছেলের জীবনে

কলেজী রোমান্স যে পরিণতি লাভ করে, তার ব্যতিক্রম হত না অনিমেষের বেলাতেও।

কবিতা লিখেই কলেজ ইউনিয়ানের সেক্রেটারী হল অনিমেষ। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল তা কবিতা নয়।

আবেগমুখী রোম্যান্টিক মন। কিন্তু একটা নিষ্ঠুর আঘাতেই সে মনের গতি ঘুরে গেল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। কবিতার স্রোত ছুটল সক্রিয় রাজনীতির খাতে। চাঁদের আলো হঠাৎ ঝড়ের কালো মেঘের করাল ছায়ার নিচে চাপা পড়ে গেল, রজনীগন্ধার গন্ধ ছাপিয়ে হঠাৎ রক্তের গন্ধের জোয়ার এল। যে অনিমেষ একদিন রাজনীতিকে মেছোহাটার দরাদরি বলে ঠাট্টা করত, সেই অনিমেষের নাম একদিন ছাত্র-সমাজকে চঞ্চল করে তুলল।

তবু মাঝে মাঝে পুরোনো দিনগুলো রক্তের মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। যেন ভুলে যাওয়া একটা গানের কলি হঠাৎ গুঞ্জন করে উঠেছে চেতনার ভেতরে। সবই তো স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন। তবু কোনো কোনো স্বপ্নের রেশ মনের ভেতরে অস্ফুট ব্যথার মতো বাজতে থাকে, কয়লার ধোঁয়ায় কালো ফ্যাক্টরীর আকাশে যেন অ্যাডোনিসের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা চকিতের জন্যে আভাসিত হয়ে ওঠে। এমনিই একদিন হয়েছিল।

মানিকতলার একটা শ্রমিক অঞ্চল থেকে ফিরে আসছিল সুমিতা আর অনিমেষ। রাত প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল—এর মধ্যে কেমন করে যেন কে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছিল, শুধু দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছিল, লন-ওলা একটা বাড়ি থেকে বিলিতী ঝাউ শব্দ করছিল, আকাশে শুক্লা রাত্রের মস্ত বড় একখানা চাঁদ জেগে ছিল আর বেতারে যেন কে চমৎকার ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছিল।

নির্জন পথে পাশাপাশি চলছিল সুমিতা আর অনিমেষ। সুমিতার কাঁধে মোটা স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝোলানো বড় একটা চামড়ার ব্যাগ, তাতে রাশীকৃত

কাগজপত্র খচখচ করছে। অনিমেষ প্রাণপণে তাকে জটিল একটা রাজনৈতিক সমস্যা বোঝাবার চেষ্টা করছিল—সুমিতা মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছিল না।

এমন সময় হঠাৎ সুমিতার খেয়াল হয়েছিল আকাশে চাঁদ উঠেছে, বিলিতী ঝাউয়ের শব্দ বয়ে দক্ষিণা বাতাস বইছে, ক্ল্যারিয়োনেটের একটা মধুর মাদক সুর রক্তের মধ্যে ঘুমন্ত স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলেছে।

সুমিতা বলে বসল, বড় ক্লান্তি লাগছে। চলো, বসা যাক।

—এখন, এই রাতে? কোথায় বসবে?

—কলকাতার পথ ঘাট সব ভুলে গেলে নাকি?—সুমিতা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল: সামনেই তো দেশবন্ধু পার্ক।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বললে, রাত কিন্তু দশটার কাছাকাছি।

—তাতে কী হয়েছে?

—পুলিশে ধরবে।

—ধরবে তো ধরুক। কিন্তু সত্যি আমি আর হাঁটতে পারছি না।

—একটা রিক্সা ডাকি তা হলে।

—আঃ, সত্যিই তুমি অধঃপাতে গেছ। এমন চমৎকার জ্যোৎস্না—সামনে এমন চমৎকার পার্ক, এখন রিক্সা চড়ে ঠনঠন করে যেতে আমার বয়ে গেছে।

হঠাৎ অনিমেষের চমক লাগল।

চাঁদ বেশ মাথার ওপর। তার সমস্ত আলো একরাশ সদ্যোফোটা বকুলের মতোই যেন সে সুমিতার মুখে উজোড় করে ঢেলে দিয়েছে। আর তার ছোঁয়ায় সুমিতার চোখ দুটিও ফুলের মতো ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশে প্রথম জেগে-ওঠা দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এই চোখ—এই চাঁদ—কতকাল আগে ভুলে গিয়েছিল অনিমেষ!

মুহূর্তের জন্যে ঘোর লাগল তার। রক্তে কথা কয়ে উঠল কথা-কলির ছন্দ। বললে, আচ্ছা চলো।

পার্কেও লোকের ভিড় নেই। যারা স্বাস্থ্যান্বেষী, তারা অনেকক্ষণ আগেই স্বাস্থ্যলাভ করে বিদায় নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু একটা বেঞ্চিতে দু একজন ভবঘুরে সাংখ্যোক্ত পুরুষের মতো নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে, অথবা আলোয় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে। অন্য সময় হলে হয়তো ওই বিড়ির আগুনের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলে উঠত, The desire of the moth for the star—

নিভৃত ঘুমন্ত পার্ক। কোথায় যেন আমের মুকুল ধরেছে, দক্ষিণা বাতাস তার জানান দিয়ে গেল। সামনে ছোট পুকুরটায় জল যেখানে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে, দুজনে সেইখানেই এসে বসল।

কিছুক্ষণ কারো কোনো কথা নেই। শুধু অনিমেষ দেখছিল চাঁদের আলোয় দুটি নক্ষত্র ফুটেছে সুমিতার চোখে। অসম্বৃত একগুচ্ছ চুল উড়ে পড়েছে ওর মুখের ওপর, একটা উজ্জ্বল সরীসৃপের মতো সরু সোনার হারটা ওর কণ্ঠকে বেষ্টন করে আছে। নীরবে একটা ঘাসের শীষ তুলে নিয়ে সেটাকে চিবিয়ে চলেছে সুমিতা।

জ্যোৎস্নায় স্নান করছে পার্ক। জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে রূপকথার মতো সামনের জলটা। জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেছে আমের বউলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় আলো হয়ে গেছে সুমিতার মুখ।

তিন বছর আগেকার কবি অনিমেষ হঠাৎ যেন ফিরে এল। অ্যাডোনিসের পায়ের কাছে হঠাৎ তরঙ্গ-মন্দ্রে মূর্ছিত হয়ে পড়ল পূর্ণিমার মায়ায় বিহ্বল সেই ঈজীয়ানের উদ্বেল উল্লাস। মনে হল পাশে সুমিতা নেই—কিরণবর্ণা অ্যাটলাণ্টা উঠে এসেছে সমুদ্রের অতল-গর্ভ কালো অন্ধকার থেকে ফুল আর জ্যোৎস্নায় ভরা পৃথিবীর এই স্বপ্নলোকে।

যেন মগ্নচৈতন্যের ভেতর থেকে কথা কয়ে উঠল অনিমেষ: আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যাগুলোকে তোমার মনে আছে সুমি?

সুমিতা ফিস ফিস করে জবাব দিলে, আছে।

—আজ অনেকদিন পরে তেমনি রাত ফিরে এসেছে, না?

সুমিতা জবাব দিলনা।

আবার চুপচাপ। বহুদিনের পর যখন হারানো স্বপ্ন ফিরে আসে, তখন হয়তো সব কথাই এমনি করে অনুভূতির অতলতায় হারিয়ে যায়। নেপ্‌লসের সমুদ্র আর দেশবন্ধু পার্কের এই জলটা যেন একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু রাস্তায় তীব্র স্বরে কুকুর ডেকে উঠল। কোথায় একটা পেটা-ঘড়ি প্রবল বেগে বাজালো রাত দশটা। খালের দিক থেকে ছ্যারারারারা করে উঠল মাল্লাদের প্রচণ্ড হোলির গান। অ্যাট্‌লান্টার স্বপ্ন বহুদূরের নিকষ কালো ঈজীয়ানে অবলীন হয়ে গেল।

অনিমেষ আত্মস্থ হয়ে উঠল—হঠাৎ হেসে উঠল হো হো করে। রাস্তায় যে কুকুরটা গলা খুলে সঙ্গীতালাপ করছিল, এই আকস্মিক হাসিতে সন্ত্রস্ত হয়ে সে সবেগে রাস্তা দিয়ে ছুট লাগালো। ওপাশের বেঞ্চির ওপরে যে লোকটা সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিল, কান খাড়া করে সে তড়াক করে উঠে বসল, জলন্ত চোখে তাকালো এদের দিকে।

—তাই বলো বাবা, প্রেম করছে। তা এমন করে হাসবার দরকার ছিল কী! শালা কাঁচা ঘুমটাকে মাটি করে দিলে।

চাপা আক্রোশে দাঁতের নিচে একটা কটু গাল বর্ষণ করে সে আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল—কাঁচা ঘুমটাকে আবার জমাতে হবে ভালো করে।

অনিমেষের হাসির শব্দে সুমিতাশুদ্ধ চমকে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত সে বিস্মিতভাবে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—অমন করে হাসলে যে ?

—নেশা ধরছিল। ছেলেবেলার বোকামিগুলো আবার সার বেঁধে পিঁপড়ের মতো মগজের ভেতরে হানা দেবার চেষ্টা করছিল।

—তাই বুঝি ওই রকম একটা বেখাপ্পা হাসি হেসে সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে ?

—নিশ্চয়। কবিতা তো কবিতা, দেখলে না, রাস্তার থেকে কুকুরশুদ্ধ তাড়িয়ে ছাড়লাম। বেচারা বাড়ি গিয়ে হার্টফেল না করে।

সুমিতা হাসল : না, তা করবে না। কিন্তু পাহারাওলা তেড়ে আসতে পারে। ভাববে আমরা এখানে মদ খেয়ে ইয়ার্কী দিচ্ছি।

—তা হলে হাসির তোড়ে পাহারাওলাকেও উড়িয়ে দেব। মনে করবে ভূত। নমুনা দেখতে চাও তার ?

—থাক, রক্ষা করো। এমন অসময়ে অত বীরত্বে দরকার নেই। কিন্তু —সুমিতা ইতস্তত করতে লাগল : একটা কথা জিজ্ঞেস করব কী ?

—স্বচ্ছন্দে।

আকাশে চাঁদ তখনো মোহ ছড়াচ্ছে। তখনো জ্যোৎস্না জলছে সামনের জলটায়। মুকুলের গন্ধ তখনো রক্তের মধ্যে নেশার মতো সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে। সুমিতার চোখে ফুটে-ওঠা নক্ষত্র দুটো তখনো নিবে যায়নি।

—সব জিনিস কি সব সময়ে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যায় ?

অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথাটা বললে সুমিতা। উড়ন্ত কতগুলো লঘু পালকের মতো কথাগুলো উড়ে গেল হালকা হাওয়ায়।

—তার মানে ?—অনিমেষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

—মানে আর কিছুই নেই—তেমনি আস্তে আস্তে সুমিতা বললে, আউটরাম ঘাটের সন্ধ্যাগুলো কি একেবারেই মিথ্যে ? জীবনে কোনো দাম, কোনো সার্থকতাই নেই তাদের ?

—হয়তো আছে। কিন্তু আজ নয়।

—কবে তা হলে?

—যেদিন অধিকার আসবে।

—কিন্তু মানুষের এই অধিকারগুলো কি কোনো মুহূর্তের মুখ চেয়ে থাকে?

—মানে?

—বলছি।—আকাশের দিকে আবিষ্ট চোখ রেখে সুমিতা বললে, ধরো একজন বন্দী। চারদিকে তার লোহা আর পাথরের বেড়া। পাহারাওলা, ওয়ার্ডার আর পেটির ঘা তার কাছে প্রতি মুহূর্তের সত্য। কিন্তু কোনো রাত্রে তার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে যদি জ্যোৎস্না পড়ে, যদি তখন তার গান গাইতে ইচ্ছে হয়, সেটা কি অপরাধ?

—অন্তত বন্দিত্বটা ভুলে যাওয়া অপরাধ বই কি।

—কিন্তু বন্দিত্বটা ভুলতে তো তাকে কেউ বলছে না। জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। বন্দিত্ব তার কালও থাকবে, এমন কি কয়েক মুহূর্ত পরেও থাকবে। কিন্তু সেই বিশেষ সময়টিতে তার মন যদি হঠাৎ মুক্তি পেয়ে বসে, তা হলে কি তুমি তাকে অস্বীকার করবে?

—রোমান্টিক বন্দীর মনোবিলাসকে আমি স্বীকার করি না!

চকিতের জন্যে সুমিতার মুখের ওপর দিয়ে কৌতুকের একটুখানি হাসি খেলা করে গেল। আজ অনিমেষও রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। মরে গিয়ে যে ম্যাগ্নোলিয়া হয়ে ফুটবার কামনা করত, গরম চায়ের কাপে যে চুমুক দিতে চাইত না ঠোঁট গলে যাওয়ার ভয়ে—আজ তারই মুখে এই কথা। অতিরিক্ত নেশা করত বলেই যেন নেশার নামে ক্ষেপে ওঠে অনিমেষ, প্রয়োজনের চাইতে ঢের বেশি গোঁড়ামি করে। যেন এতকাল ধরে অজ্ঞানের মতো যে পাপ সে করেছে আজ একটা সজ্ঞান চেতনা লাভ

করে সেই পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। শুধু ষোলো আনা নয়—তার চাইতে আরো কিছু বেশি, একেবারে আঠারো আনা!

সুমিতা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব।

অনিমেষ একটা সিগারেট ধরালো। খুশিমুখে খানিক ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে প্রসন্ন ভাবে বললে, বেশ, করো তর্ক।

—রোমান্টিক হওয়া কি এমনি ভয়ঙ্কর অপরাধ?

অনিমেষ অনাসক্ত হয়ে বললে, জবাব দেওয়া অনাবশ্যক।

—কেন?

—কারণ প্রশ্নটাই তামাদি হয়ে গেছে। Barred by limitation!

—ফাঁকি দিলে তুমি।

—ফাঁকি দেব কেন? ও কথার জবাব এতবার এত লোকে দিয়েছে যে তার পরে ও সম্পর্কে আর কিছু বলবারই দরকার নেই।

—মোটেই না। কোনো লোক এ কথার জবাব দেয়নি। যারা রোমান্টিক নয়, তারা নন্‌রোমান্টিক হওয়ার জন্যেই রোমান্টিক।

—অত্যন্ত বাজে কথা— অনিমেষ সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগল।

—বাজে কথা? কে রোমান্টিক নয়, বলতে পারো? আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো বাস্তব আর কিছুই হতে পারে না, সে কথা মানো কিনা? মাথার ওপরে বোমারু, সামনে শত্রু আসছে—মেশিনগানের গুলি কানের কাছে শিস্ দিয়ে যাচ্ছে, এর চাইতে নিষ্ঠুর রিয়্যালিটি আর কিছু নেই নিশ্চয়?

—সেটাও পুরো রিয়্যালিটি নয়, তবু মানলাম।

—আচ্ছা বেশ। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বসে যাওয়া ট্রেঞ্চের ভেতরে এক সৈনিকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। বুকের কাছে তার পকেট বইতে দেখা

গেল এক গুচ্ছ শুকনো মৌশমী ফুলের পাপড়ি আর একটি মেয়ের ফোটো। তখন তাকে তুমি কী বলবে ?

—বলব, মেয়েটির সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে বেচারা বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে শত্রুর বুলেট্ এসে তার পাঁজরা ফুটো করে ফেললে। অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত ওটা। কিন্তু ওসব অ্যাকাডেমিক তর্ক এখন থাক—সিগারেটটাকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে অনিমেষ বললে : ও রবারের মতো, টানলেই বাড়তে থাকবে। তার চাইতে উঠে পড়া যাক—অভদ্র রকমের রাত হয়ে গেছে।

পৃথিবী আরো নীরব, জ্যোৎস্না আরো বিহ্বল, আমের মুকুলের গন্ধ আরো গভীর আর জলটা আরো জ্বলন্ত। অনিমেষের চোখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলল সুমিতা। অনিমেষ যা বলেছে, এ ওর নিজের কথা নয়। ওর মনের ভেতর যে সুরের সাড়া গুন গুন করে উঠছে, তাকে গলার জোর দিয়ে চাপা দিতে চায়, 'বুলি' করে আত্মনিগ্রহ করতে চায়। সুমিতা জানে, ওর সঙ্গে অনিমেষের মতের কোনো তফাৎ নেই, বরঞ্চ যেগুলো ও ভালো করে বলতে পারেনি, তাদের আরো চমৎকার করে—আরো সুন্দর করে বলতে পারত অনিমেষ। কিন্তু সে কথা সে বলবে না, নিজেকে শাস্তি দেবে; অনেক বিভ্রান্তিভরা রাত্রি—অনেক আত্মমগ্নতার দুর্বল মনোবিলাস, অনেক কার্থেজ আর উজ্জয়িনীর স্বপ্নকে নিষ্ঠুর আঘাতে যেমন করে হোক সে ভেঙে-চুরে দেবেই। পরম বস্তুবাদী আদিত্যদা আজো কবিতা পড়ে খুশি হতে রাজী আছে, কিন্তু অনিমেষ নয়। সে রোমান্টিক কবিদের—এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

দুজনে আবার পথে নেমে পড়ল। আবার নীরবতা। দুজনেই দুজনকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কোনো উপায় নেই। জীবনের গতি যখন ঘুরেছে, তখন একান্ত করেই ঘুরেছে। কোন মধ্যপন্থা নেই, আজ আর

কোনো মধ্যপন্থার প্রশ্নও যেন অবান্তর। নিজের মনকে এখনো বিশ্বাস করে না অনিমেষ, সুমিতাও না। একটুখানি চাঁদ আর একটুকু বিহ্বল মুহূর্ত হয়তো আদর্শের দৃঢ় কঠিন প্রাচীরে এমন একটা ফাটল ধরিয়ে দেবে—যেখানে দিয়ে ঢুকবে অসংযমের বাঁধভাঙা বন্যা—প্রতিজ্ঞাকে সহস্র মুখে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তার চেয়ে এই ভালো। কোনোদিন কবিতা ছিল না, কোনোদিন প্রেম ছিল না। একটা দূরপ্রসারী পথ—সংশয়ে শঙ্কিল, সঙ্কটে বন্ধুর। সে পথে পাশাপাশি চলেছে দুজনে। সুমিতার চোখ থেকে দুটি শান্তোজ্জ্বল সন্ধ্যা-নক্ষত্র নিবে গেছে অনেকদিন আগে, শুধু সেখানে জ্বলে যাচ্ছে উল্কার প্রখর শাণিত শিখা।.........

... চমক ভাঙল। অনিমেষ পাশে নেই। কয়েক মাস আগে সে বেরিয়ে চলে গেছে একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে, চা-বাগানে অর্গানাইজেশন গড়ে তুলতে হবে। ওখানে যারা কাজ করছিল, কেউ সুবিধে করতে পারিনি; তারা কলকাতা থেকে যোগ্য লোক চেয়ে পাঠিয়েছে—যে ভালো করে ওখানে একটা 'সেল' গড়ে দিয়ে আসতে পারে। তা ছাড়া স্থানীয় কর্মীরা প্রায় সকলেই বড় বেশি মুখ চেনা, নতুন লোক হলে তার পক্ষে বাগানে ঢোকা সহজ হবে।

ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যতম চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে চা-বাগান। সেখানে এখনো আফ্রিকার আদর্শে রাজ্যপাট চলছে। সেখানে শ্রমের দাম নাম মাত্র, জীবনের দামও প্রায় তাই, ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর মানুষের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, যেটুকু বাকী আছে, তাকে শেষ করে দিচ্ছে ম্যানেজার থেকে নিম্নতম বাবুটি পর্যন্ত। বাইরে থেকে কারো সেখানে ঢুকবার জো নেই—যে ঢুকবে তাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা হবে।

তাই অনিমেষকে পাঠানো হয়েছে বাগানে। যেমন করে হোক ঢুকতে

হবে, যেমন করে হোক বহুদিনের নিশ্চিন্ত রাজ্যপাটে ফাটল ধরাতে হবে। অনিমেষ চলে গেছে কয়েক মাস আগে, ওদিকে সব দেখে, শুনে জেনে, নানা বাগানে ঘুরে একটা সাহেব-বাগানে চাকরী জুটিয়েছে। কাজকর্মও করছে ভালো। তারপর দিন কয়েক আগে এসেছে দুঃসংবাদ। কী একটা অঘটন ঘটেছে, ছুটে গেছে আদিত্য। অনিমেষ আদিত্যের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, একজনকে বাদ দিলে আর একজনের যেন নিজের ওপরে কোনো জোরই থাকেনা। অথচ এ পর্যন্ত অনিমেষ বা আদিত্য কারো খবর এল না। তার কাছে নয়, মণিকাদির ওখানেও নয়। কী যে হয়েছে কে জানে।

রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তেমনি করে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। সমস্ত চৈতন্যটা যেন বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। ঠিক উৎকণ্ঠা বোধ হচ্ছে তা নয়—কেমন একটা অনাসক্তি তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ধরেছে। সুমিতা বুঝতে পারছে লক্ষণটা ভালো নয়—হারানো চাঁদ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে, তার রক্তে রক্তে ছায়া সঞ্চার করছে। তাই অলক্ষ্যে থেকে অনিমেষ—

নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করলে সুমিতা। শীতের রোদে চাঁপা ফুলের রঙ। সামনে সেন্ট্র্যাল অ্যাভিনিউতে গাড়ির স্রোত। একখানা 'এ-আর-পি'র মোটর তীরবেগে বেরিয়ে গেল—যেন ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতার আভাস দিচ্ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পড়েছে সতর্কতামূলক' পোস্টার। ওপাশের লাল বাড়িটার গায়ে দুজন বিকৃত বীভৎস-মুখ জাপানীর চিত্র। একজন হাতে ফুলের মালা নিয়ে পরম স্নেহভরে বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছে আর একজন জানোয়ারের মতো বত্রিশটা তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে তার পেছনে সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। প্রচার-পত্র বড় বড় হরফে বলে দিচ্ছে : ভুলেও ভুলবেন না। এরাই আপনাদের শত্রু—

হঠাৎ হাসি পেল। ছবিটা এঁকেছে মন্দ নয়। মানুষকে কত বিকৃত

করে দেখানো যায় তার নমুনা। জাপানীরা ইংরেজের কী জাতীয় কার্টুন আঁকে জানতে ইচ্ছা করে—অন্তত তাদের হাতে কী রকম রূপ পায় উইন্‌স্টন চার্চিলের মুখখানা।

বাড়ির নীচে দুখানা রিক্‌সা এসে থামল। সুমিতার দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠল মুহূর্তে। চারটি ছেলে নেমেছে রিক্‌সা থেকে। বার বার করে তারা বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে দেখল, তারপর তাকালো এ ওর মুখের দিকে। যেন ব্যাপারটা তারা বিশ্বাস কবতে পারছেনা। মাণিকতলারএকটাঅন্ধকারখোলারঘরথেকেসেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের এই রাজপ্রাসাদে তাদেব পদোন্নতি—এটা যেন তারা স্বপ্নেরও অতীত বলে মনে করছে। সুমিতা সকৌতুকে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

একজন বললে, দূর, ভুল হয়েছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাকী দুজন তেতলার বারান্দায় দেখে ফেলেছে সুমিতাকে। উল্লাসে তারা চীৎকাব করে উঠল : আরে, ওই তো সুমিতাদি।

চারজনের দৃষ্টি একসঙ্গে সুমিতার ওপরে গিয়ে পড়ল। সত্যিই সুমিতাদি—অবিশ্বাস্য হলেও এ বাড়ির মালিক এখন তারাই। খোলার ঘরের অন্ধকারে ঠাণ্ডা মেজেতে শুয়ে শুয়ে আর ইঁদুর তাড়াতে হবে না, মস্ত বাড়িতে নিশ্চিন্ত আরামে রাজাব হালে তারা ঘুমুতে পারবে।

—ও সুমিতাদি, ভেতরে যাবো কোন্ রাস্তায়? সব তো বন্ধ।

—দাঁড়াও ভাই, আমি আসছি, সদর খুলে দিচ্ছি।

দ্রুতগতিতে ভেতবে চলে এল সুমিতা, তর তর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। ছেলেরা সবাই এসে পড়েছে। এখন তার অনেক কাজ। এই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে—এদের সামলাতে হবে, এই হচ্ছে আদিত্যদার আদেশ।

অনিমেষের কথা ভাববার সময় নেই এখন, আদিত্যেরও নয়। সুমিতার এখন অনেক কাজ।

চার

কলকাতায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট হয়নি, শুধু আলোগুলোর মুখে কালো ঘোমটা নেমেছে। মাঝে মাঝে পুরো অন্ধকারের মহড়া চলে। অস্বাভাবিক একটা বিভীষিকার মতো অন্ধকারের কালো গুণ্ঠন কলকাতাকে ঢেকে দেয়—ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, চারদিকের বাড়িঘরগুলো থেকে দানবীয় চিৎকার ওঠে। সে চিৎকার আনন্দের না ভয়ের ঠিক বোঝা যায় না। মোড়ের বিড়িওয়ালা অশ্লীলভাবে অশ্লীলতম একটা গানের কলি চিৎকার করে ওঠে—মনের নিরুদ্ধ পশুটাকে মুক্তি দেবার পক্ষে এর চাইতে চমৎকার সুযোগ আর কী হতে পারে? মনে হয় এ অন্ধকার কলকাতার ওপরতলার নয়—নিচের ড্রেন-পাইপের কালো গর্তের থেকেই এ বস্তু ওপরে ঠেলে উঠেছে। তেমনি বিষাক্ত, তেমনি শ্বাসরোধী, তেমনি কদর্য আর তেমনি পূতিগন্ধী।

আর বাকী সন্ধ্যাগুলো ঘোমটা-পরা আলোর অনুগ্রহে অস্বচ্ছ, অনুজ্জ্বল। একটা প্রেতপিঙ্গল আভায় চারদিকের মানুষ-জন, বাড়িঘর গাড়ি-ঘোড়া—সব যেন অশরীরী ছায়ামূর্তির মতো নাচতে থাকে। সব বদলে গেছে, সব অন্যরকম হয়ে গেছে। এ কলকাতা আলাদা। এ কলকাতা অচেনা। এখানকার মানুষগুলো একটা পাথরের মতো গুরুভার ভয় বুকে চাপিয়ে নিয়ে যেন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। আর পালাচ্ছে প্রাণপণে—পালাচ্ছে কুৎসিতভাবে—প্রাণরক্ষার একটা ঐকান্তিকী জৈব তাড়নায়। 'থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা'—পথ চলতে চলতে চলতে এই গানের কলিটাই বার বার করে আদিত্যের মনে পড়ছিল।

একহাতে একটা ছোট সুটকেশ নিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছিল

আদিত্য। সাড়ে দশটার ট্রেনটা তাকে ধরতে হবে—যদিও ট্রেন ছাড়তে এখনও দু ঘণ্টার ওপর দেরী আছে। গাড়িটা সাইডিং থেকে এসে প্ল্যাটফর্মে ইন্ করবার আগেই চলতি অবস্থায় তাতে ঝাঁপিয়ে উঠতে হবে—একেবারে ওস্তাদ সাঁতারুর ডাইভ করবার কায়দায়। না হলে পরমুহূর্তে লাঠিঠ্যাঙা এবং বিপুল জনতার এমন তরঙ্গ আসবে যে, মুহূর্তে পিষে ফেলে দেবে একেবারে। যতই আত্মবিশ্বাস থাক, গণ-দেবতার এই ভৈরব সংঘাতকে ভয় করে না, এত বড় সাহসী পুরুষ আদিত্য নয়।

বড় রাস্তা বিপজ্জনক। একচোখ মোটরগুলো এর মধ্যেও পাগলের মতো ছুটছে। আলোটা মোটরের কোন্ দিকে যে জ্বলছে ঠিক ঠাহর করা যায় না—বিব্রত পথচারী পাশ কাটাতে গিয়ে অনেক সময় সোজা মোটরের তলায় গিয়ে ঢোকে। সুতরাং সন্ধ্যার পর গলিই নিরাপদ—যদিও এর মধ্যেই গুণ্ডার আবির্ভাব ঘটেছে শহরের অন্ত-প্রত্যন্তে। অন্ধকার কলকাতার ভূগর্ভবাহী বিষদিগ্ধ নালাগুলো থেকে দানবের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তবু গলিই ভালো।

পায়ের নিচে স্তূপাকার আবর্জনা মাড়িয়ে আদিত্য এগোতে লাগল। চাপা গলির দুপাশে বীভৎস দুর্গন্ধ পাক খাচ্ছে। তার ওপরে খাদ্য খুঁজছে পথের কুকুর—অন্ধকারে তাদের চোখগুলো বুনো জানোয়ারের মতো জ্বলছে। ওই কুকুরগুলোকে দেখেও এখন ভয় করে। শ্মশান-কলকাতার বুকে যেন ওরা শ্মশান-কুকুর—ভীত আতঙ্কিত মানুষের কাঁধের ওপরে এই সুযোগে ওরা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

চুরুটটা ধরিয়ে নেওয়া দরকার। এই আবর্জনার ভেতরেও আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি ধরালো। সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা তিরস্কার।

—আসবে তো এসো না। অত পরখ করবার কী দরকার?

আদিত্য চমকে উঠল। ভৌতিক গলা নাকি? না—ভূতের চাইতেও মারাত্মক। অন্যমনস্ক আদিত্যের এতক্ষণ চোখেই পড়েনি এই সরু গলির দুপাশের রোয়াকে আর দরজায় কারা মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বিড়ি টানছে, কেউ সিগারেট।

এতটুকু দেশলাইয়ের কাঠি, এইটুকু আলো। তবু মলিন অন্ধকার গলিটা যেন অতিরিক্ত আলো হয়ে উঠেছে—আলোর খোঁচা তীক্ষ্ণমুখ আলপিনের মতো গিয়ে বিঁধছে নিশাচরীদের চোখে। দুপাশে রং-বেরংয়ের কাপড় পরা বিকৃত নারীপণ্য। কলকাতার পঃপ্রণালীর আরেক রূপ। ক্রূর বিসপিল কামনার কদর্য প্রবাহিকা।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী? আসবে তো চলে এসো না নাগর।

দুপাশের মূর্তিগুলো প্রেতিনীর মতো খিল খিল করে হেসে উঠল। নিশ্চয় ভেবেছে নবাগত—এ পথে নতুন সংশয়গ্রস্ত পথিক। চুরুট আর ধরানো হল না, পালাতে পারলে বেঁচে যায় আদিত্য।

—আহা, পালাচ্ছ কেন? ট্যাকে পয়সা নেই বুঝি? খালি দেখেই সুখ?

আদিত্য প্রায় ছুটে চলেছে একরকম। পেছনে থেকে হাসির আওয়াজ কানে আসছে, ওর কাপুরুষতায় ভারী কৌতুক অনুভব করছে ওরা।

গলি দিয়ে আসতে গিয়ে এই বিড়ম্বনা। শর্টকাট করবার বিঘ্ন অনেক। কিন্তু আদিত্য ভাবতে লাগল: এরা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, এখনো প্রতীক্ষা করে আছে কিসের আশায়? ওদের খদ্দেরেরা তো প্রায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে—ওদের কি কোনোখানে যাওয়ার জায়গা জুটল না? পরিত্যক্ত কলকাতার পাপ আর আবর্জনার বোঝার সঙ্গে ওরাও কি এইখানেই পড়ে রইল? সভ্যতার যে নরকে এসে ওরা নেমেছে, সেখানে ওদের নতুন করে কিছু ভাববার নেই, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকবার

জন্যে ওদের যে দুঃসহ যন্ত্রণা, জাপানী বোমা তার চাইতে বেশি দুঃখ ওদের আর কী দিতে পারে? সমাপ্তি ঘটে অকথ্য ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে, গুণ্ডার ছুরি আর মদের গ্লাসে আর্সেনিকে, একেবারে একটা বিকট বিস্ফোরণের মধ্যে সেই সমাপ্তি যদি ওদের কাছে নেমে আসে, তাহলেও অনুযোগ করবার কিছুই নেই ওদের।

চলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও দ্রুতগতিতে চলছিল। তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌছুনো দরকার। পরে আর গেটের ভেতর ঢোকা যাবে না। অনিমেষের খবরটা দুশ্চিন্তার একটা পাথরের মতো চেতনার ওপরে চেপে বসেছে। কী যে হয়েছে কে জানে—ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে কোনো রকম ঘটনা যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। চা-করদের অপরিসীম মহিমা আর দোর্দণ্ড প্রতাপের ইতিবৃত্ত অজানা নেই আদিত্যের।

কিন্তু চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল।

ছোট গলির পাশে আবার কাণাগলি। কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফলেই বোধ হয় সেখানে আধখানা গ্যাস জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল, কাণাগলির ভেতর দিয়ে টলতে টলতে একটি কাপ্তান বেরুল। যাক, রোয়াকে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একেবারে হতাশ্বাস হওয়ার মতো অবস্থাটা এখনো ঘটেনি তাহলে!

লোকটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল। পরম বিরক্তিভরে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে আদিত্য, এমন সময় আধখানা গ্যাসের আলোয় হঠাৎ তাকে চিনতে পারল। এবং চেনবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড চমক তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল!

লোকটি হেমন্তবাবু।

হেমন্তবাবু! তাদের পাড়ারই মানুষ। কী একটা ব্যাঙ্কের সামান্য

কেরাণী, আধবুড়ো নিম্নবিত্ত ভদ্রলোক। শান্ত এবং নির্জীব। ন'টা না বাজতেই অফিসে ছোটে, ফেরে বিকেল পাঁচটায়। নিজের দীনতায় সব সময়ে নিচু হয়ে থাকে—সহজে চোখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলে না। সেই হেমন্তবাবুর পেটে পেটে এই বিদ্যে।

হেমন্তবাবু তাকে চিনেছে। অথচ আশ্চর্য, লোকটা লজ্জা পেল না। বরং পরম কৌতুক ও কৌতূহলভরে হো হো করে মাতালের হাসি হেসে উঠল।

—কী দাদা, তুমিও এই দলে? বাইরে ভালো মানুষটি, ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না, আর ভেতরে ভেতরে অ্যাঁ—

হাসির আবেগে টলে পড়ে যাচ্ছিল হেমন্তবাবু, হঠাৎ গ্যাসপোস্ট্‌টা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিলে।

আদিত্য বললে, পথ ছাড়ুন। বুড়ো বয়সে এসব করে বেড়াচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?

—লজ্জা? লজ্জা কিসের বাবা? ওসব তোমাদের ভূষণ। আমাদের তো পেটেও নেই, পরণেও নেই। একটু ফুরতি করব, তাতেও তোমরা বাগড়া দিলে চলবে কেন?

—পথ ছাড়ুন।—আদিত্য অধৈর্য আর বিপন্ন বোধ করতে লাগল।

—পথ ছাড়ব? আচ্ছা বেশ। কিন্তু সোনার চাঁদ, একটা কথার জবাব দাও দিকি। তোমরা সব ভালো লোক—তোমাদের এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে আমাদের এই হাড়কাটায় এসে ঢুকলে কেন? সবই তো বাবা নিয়েছ, ভালো চাকরী, ভালো বাড়ি, ভালো খাবার—আমাদের খেঁদী পাঁচী বিদ্যেধরীদের দিকেও হাত বাড়াতে চাও? এমনিতে পথ ছাড়ব না বাপধন, কৈফিয়ৎ চাই।

আশ্চর্য, হেমন্তবাবুরও কৈফিয়ৎ চায়। সেই কোলকুঁজো লোকটা, যার মেরুদণ্ড চাকরীর চাপে ধনুকের মতো বাঁকানো, পৃথিবীর সকলের কাছে

মাথা নুইয়ে নুইয়ে যার ঘাড় ঝুলে পড়েছে, সে কিনা আদিত্যের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এল! যার জোর গলার আওয়াজ কেউ কখনো শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ—সেই হেমন্তবাবু যেন সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মতো অকস্মাৎ উদাত্তকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার নির্বোধ ভীত চোখে যেন হঠাৎ জ্বলে উঠেছে পৌরুষের আগুন। একি শুধুই মদের নেশা, না আরো কিছু আছে এর পেছনে? বাইরের পৃথিবীতে, সভ্য ভদ্রলোকের জগতে ভয় পায় হেমন্ত বাবুরা, তারা চোখ তুলে চাইতে জানে না, কথা কইতে ভরসা পায় না। সেখানে যেন তারা অনধিকারী। কিন্তু এই অন্ধকার হাড়কাটা গলিতে তারা যেন নিজের রাজ্য ফিরে পায়, মদের তরল তীক্ষ্ণ ধারা তাদের বুকের মধ্যে প্রদীপ্ত পৌরুষকে জ্বালিয়ে তোলে—নিজস্ব গৌরব এবং মর্যাদায় তারা আদিত্যদের পথ আটকায়, জবাবদিহি দাবী করে।

আদিত্য বললে, হেমন্তবাবু সরুন, আমাকে স্টেশনে যেতে হবে।

—স্টেশনে? তাই বলো। পালাও বাবা, পালাও। কলকাতায় মধু নেই তো, এখন সটকান দিয়ে প্রাণ আর পিত্তি রক্ষে করো। তোমরা সব সুখের পায়রা হে—হে—হে—

আবার প্রচণ্ডভাবে হাসতে সুরু করে দিলে হেমন্তবাবু। থুথুর কণা ছিটকে এসে আদিত্যের মুখে এসে পড়তে লাগল, নাকে আসতে লাগল দিশি মদের উগ্র অম্ল গন্ধ। আদিত্যের ইচ্ছে করতে লাগল এক ধাক্কা দিয়ে ডাস্ট্ বিনের মধ্যে উল্টে ফেলে দেয় হেমন্তবাবুকে—তার সময় নেই, এর পরে আর প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যাবে না। কিন্তু হেমন্তবাবুর বলার মধ্যে এক বিন্দুও সত্যি নেই কি?

—আপনি পথ ছাড়বেন, না ধাক্কা মেরে চলে যাবে?

—ছাড়ব বইকি, ছাড়ব বইকি। আপনাদের পথ কি আমরা কখনো আটকাতে পারি স্যার? আপনাদের দামী জীবন স্যার—পাঁচ শো সাত শো

হাজার টাকা মাইনে পান, আপনাদের মারতে পারে কে? কিন্তু আমার তো পালাবার উপায় নেই, ঘুষ দেবারও পয়সা নেই। বোমা খেয়ে ঘরে বউ ছেলেমেয়ে মরুক, এখানে আমি পাঁচীকে আঁকড়ে নিয়েই উড়ি। ধাঃ—শালা, চুকে যাক ল্যাঠা।

হাতের কাছে পাঁচীকে পাওয়া গেল না, কাজেই ল্যাম্পপোস্ট্‌টাকে আঁকড়ে হেমন্তবাবু মাটিতেই বসে পড়ল।

—এই বসলাম। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং উঁহু। এসো বাপ জাপানী বোমা, তোমার সঙ্গেই মোলাকাৎ হোক।

পাশ কাটিয়ে তীরের মতো এগিয়ে গেল আদিত্য। পেছনে তখন চিরনির্বাক হেমন্তবাবু প্রাণ খুলে একখানা বিচিত্র দুর্বোধ্য গান ধরেছে—হয় তো পেশোয়ারী ঠুংরী কিংবা আফগানী গজল।

আর গলি নয়, ঘুরে ফিরে এবার মীর্জাপুর স্ট্রীট।

ওদিকের ফুটপাথে পানের দোকানে কতগুলো লোক জটলা করছে। লুঙ্গি, লাল গেঞ্জী আর গিলে করা পাঞ্জাবীপরা গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক। পান খাচ্ছে, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত আর নির্ভীক। ওরা জানে ওদেরই দিন এসেছে এইবারে।

তবু ওর ভেতর থেকে একজন আদিত্যকে দেখই চট করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিতান্ত উদাসীনের মতো যেন সান্ধ্য-ভ্রমণ করবার জন্যেই ধীর মন্থরগতিতে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

কিন্তু আদিত্যের দৃষ্টি এড়াল না। টিকটিকি। এই ডামাডোলের মাঝখানেও ভয় পায়নি, কর্তব্যবুদ্ধি হারায়নি। বরং ভারতরক্ষা বিধান আইনে অনেকগুলো নতুন হাতিয়ার পেয়েছে হাতে। ওদের প্রভুভক্তি অতুলনীয়—মরে নিশ্চয়ই কুকুরের স্বর্গলোক লাভ করবে।

আদিত্য তাড়াতাড়ি চলেছে, লোকটারও যেন কাজের তাগিদ বেড়ে

গেছে অত্যধিক পরিমাণে। যেন সাড়ে দশটার ট্রেনটা না ধরলে ওরও চলবে না—অনিমেষের মতো ওরও কোনো বিপন্ন বন্ধু সেখানে হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য রেখে লাভ নেই। যা খুশি করুক—যতটুকু পারে কর্তব্য পালনের আনন্দটা উপভোগ করে নিক। কিন্তু সামনে আসছে শিয়ালদা স্টেশনের মহাসাগর, সেখানে ওর যে কিছুই করবার নেই, আদিত্য তা ভালো করেই জানে।

অনুমানটা একেবারে মিথ্যাও হল না।

মেইন গেটে ঢোকবার মুখেই বাক্স প্যাঁটরা, মানুষ, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি আর চারদিকের প্রায়ান্ধকারে একেবারে হারিয়ে গেল আদিত্য, হারিয়ে গেল সমুদ্রবেলায় একটি বালিবিন্দুর মতো। সরকারের ঘ্রাণকুশল বুলডগ এই জনারণ্যে তাকে খুঁজে পেল না।

সে খুঁজে পাবে কি, নিজেকেই নিজে খুঁজে পায়না আদিত্য—এমনি অবস্থা।

কী করে যে ট্রেনে উঠল নিজেও তা ভালো করে বুঝতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত পিণ্ডাকার ধ্বস্তাধস্তি, তারপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় বন্দুকের গুলির মতো জানালা ডিঙিয়ে ভেতরে ছটকে পড়ল একখানা বেঞ্চের ওপর। তারপব টাল সামলে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল কাঠের দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চের এক পাশে ইঞ্চিকয়েক জায়গায় সে কচ্ছপের মতো সংকীর্ণ হয়ে আছে। কোনো অবস্থাতেই মানুষের যে অতখানি সংকুচিত হওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে—এটাকে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বলে মনে হল।

মাত্র দু মিনিট কি তার চাইতেও কম। তারপরে আর শর্ষে ফেলবার জায়গা রইল না। গরমে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম—দর দর করে ঘামের স্রোত নেমে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিতে লাগল। আ এরই মধ্যে চোখে পড়ল

ঘড়ির কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, শক্ত খদ্দরের পাঞ্জাবীটাও আধাআধি ছিঁড়ে নেমেছে একরকম।

তবু নিশ্চিন্ত আরামে একটা চুরুট ধরালো আদিত্য। অন্তত সে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত, গিয়ে পৌঁছুতেও পারবে হয়তো।

কিন্তু বাইরে প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়েছে তখন। যারা ভেতরে উঠতে পেরেছে তারা আর অপেক্ষা না করে পত্রপাঠ নামিয়ে দিয়েছে শার্শী আর কাচের জানালাগুলো। যারা বাইরে আছে তারা দমাদ্দম শব্দে বন্ধ দরজা জানলায় কিল ঘুষি চালাচ্ছে—লাঠির ঘা মারছে। আর সবশুদ্ধ এমন দানবীয় কোলাহল উঠছে যে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম।

ঝন ঝন ঝন—

প্রচণ্ড আঘাতে ওদিককার একটা কাচের জানলা ভেঙে পড়েছে। তীরের মতো কাচের টুকরো উড়ে এল, তারপরেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

—আহা-হা—

—একদম খুন কর দিয়া—

—মারো শালাকে—

তারপর ভেতরে বাইরে অশ্লীলতম ভাষায় গালাগালি। ভদ্রাভদ্র, বাঙালি হিন্দুস্থানীর বাছবিচার নেই, ভয়ের মর্মান্তিক তাড়নায় মানুষ তার খাঁটি অনার্য আদিমতাকে খুঁজে পেয়েছে।

আদিত্য চুরুট টানতে লাগল। কামরায় বাতাস আসবার এতটুকু পথ নেই। যেটুকু ছিল তা এত মানুষের নিশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিশেছে রাশি রাশি বিড়ি সিগারেট, সেই সঙ্গে নিজের চুরুটের ধোঁয়া। পাশেই ল্যাভেটরী, মানুষের চাপে তারও দরজাটা একেবারে খোলা—দুর্ভাগ্যের যেটুকু বাকী ছিল, ওখান থেকে যে তীব্রতর গন্ধটা আসছে তাতে তাও পূর্ণ হয়ে গেছে। রুমাল ঘুরিয়ে আদিত্য বৃথাই খানিকটা বায়ুলাভের চেষ্টা করতে লাগল।

চারদিকে আলোচনার আর বিরাম নেই। কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে। কারো কাছে একটি কচি শিশু আছে বলে মনে হয়—মাঝে মাঝে প্রবলবেগে সে ডুকরে উঠছে। নিশ্চয় কামরায় ওঠবার সময় সেই মল্লযুদ্ধের পরে কোথাও চোট লেগেছে তার। একটা বিরক্ত পুরুষ-কণ্ঠ বীভৎসভাবে ধমক দিচ্ছে: চুপ চুপ! গলা টিপে মেরে ফেলব কিন্তু।

গলার আওয়াজে মনে হল কাজটা তার পক্ষে একেবারে অসাধ্য ব্যাপার নয়।

বাঙলা-হিন্দী-উর্দুতে মেশানো আলাপ-আলোচনা তো চলছেই; কেউ শোক করছে অমন কারবারটা এবারে গেল; কারো চাকরির মায়া ছাড়তে হয়েছে, এবার দেশে ফিরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। তেতারিয়ার মা ব্যাকুল স্বরে বলছে, তার জোয়ান মেয়েকে সে হারিয়ে ফেলেছে, এই ভিড়ের মধ্যে কোন্ গাড়িতে কাদের পাল্লায় সে পড়েছে কে জানে। কোন্ এক অতুলদার কোন্ এক ভাই তার বৌদিকে বোঝাচ্ছে যে, অতুলদা অত্যন্ত হুঁশিয়ার মানুষ—তাঁর জন্যে ভাবনার কিছুমাত্র কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু অতুল-বৌদি বুঝছেন না—তিনি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন—গাড়ির অনুজ্জ্বল আলোতেও তাঁর কপালের সিন্দুর বিন্দুটা বড় বেশি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। অশ্লীল ইয়ার্কিও চলছে, চলছে হিন্দী সিনেমার গান। ওদিকে স্তূপাকার একটা বিছানার ওপরে আসীন দুজন প্রৌঢ়বয়সী হিন্দুস্থানী এর ভেতরেও সুর করে কী একখানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুরু করেছে—খুব সম্ভব তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'। শ্মশান-বৈরাগ্যই বোধ হয়। বাইরে প্রবল কোলাহলে স্টেশন ফেটে যাচ্ছে, ভেতরে যারা আছে, তাদের সে সম্বন্ধে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই; যেন জাহাজ ডুবছে—সেই অবসরে তারা লাইফবোট আশ্রয় করে সমুদ্রে ভেসে পড়েছে নিশ্চিন্তে।

আর রাজনীতি, যুদ্ধের আলোচনা তো আছেই।

—জাপানী লোগ তো আ গিয়া।

—জরুর। মাণিক লালজী বোলা রহা কি দো-চার রোজ মে কলকাত্তা একদম চুর চুর হো যায়ে গা।

—অ্যায়সা—হাঁ?

—আখবার নেই দেখা? রংগুণমে ভি ভারী জং লাগ গিয়া—অংরেজ লোক একদম—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

—হাঁ—অ্যায়সা?

—ও আর কিছু হবে না দাদা। সিঙ্গাপুরে প্রিন্স অব ওয়েলস্ আর রিপাল্সের সঙ্গে সঙ্গেই যা হবার হয়ে গেছে।

—সেদিন টোকিও রেডিও থেকে কী বলেছে শোনেননি? Where is the great British Navy? Under the sea! Where is the great Commander-in-Chief? He is commanding his fleet at the bottom of Pacific!

—বাঃ, বেড়ে বলেছে তো! ব্যাটাদের রসবোধ আছে।

—আজকের কাগজ দেখেছেন তো? রেঙ্গুনে শত্রু-বিমানের বোমা বর্ষণের ফলে কয়েকজন অ-সামরিক হতাহত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

—তাই বটে! দেখুন গে, এতক্ষণে সব লেভেল করে দিয়েছে। মিথ্যে কথা তো বলবেই—লোকের 'মোরেল' ঠিক রাখা চাই তো।

—হাঁ—হাঁ—'মোরেল'। ও নিয়ে আর মোড়লী না করে নিজেদের 'মোরেল' ঠিক রাখুক গে—যুদ্ধটা জিততে পারবে।

—হুঁ, জিতবে। গোড়া থেকেই তারই তো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

—আহা ঘাবড়াচ্ছেন কেন! এ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজির যুদ্ধ—ওয়ার অব

নার্ভস। ব্লিৎসক্রীগ দেখিয়ে চমক দিলেই হয় না মশাই, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

—রাত তো পুইয়েই গেল দেখতে পাচ্ছি। এর পরে আর মারের সময় আসবে কখন বলুন দেখি?

—আসবে, আসবে। সেদিন কাগজে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন নি? অ্যাংলো-আমেরিকান এয়ার ফোর্স ইচ্ছে করলে তিন দিনে ফুজিয়ামা শুদ্ধ জাপানকে জাপান সাগরের নিচে পৌঁছে দিতে পারে।

—তা ইচ্ছেটা তাঁরা করছেন না কেন? আপনি মশাই দুখানা টেলিগ্রাম করে দিন না চার্চিল আর রুজভেল্টকে—কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে আপনার।

—ওরকম পার্সোনাল অ্যাটাক করছেন কেন মশাই? তর্ক করবেন তো ভদ্রভাবে করুন।

—কী বললেন! আপনার কাছ থেকে ভদ্রতা শিখতে হবে নাকি? মহা ভদ্রলোক দেখছি যে! বলি মশায়েব পেশাটা কি, নিবাস কোথায়?

তারপর ভদ্র-ভাষায় অভদ্র এবং অভদ্রতর বাক্য বিনিময়। বাঙালি যুদ্ধ করতে পারে না, তাই যুদ্ধ করবার আগ্রহ ও উত্তেজনা এই পথেই ব্যয় করেছে। মনে হল, এরা ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তেই যুদ্ধের যা কিছু জটিলতার মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।

—থামুন দাদারা, আর বকাবকি করবেন না। এর পরে যে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স-অ্যাক্টে পড়বেন, সে খেয়াল নেই বুঝি? সরকারী প্রচার-পত্র পড়েন নি? শত্রুর কান চারিদিকেই খাড়া হইয়া আছে?

বেশ উপভোগ্য লাগছে আদিত্যের। আলোচনা শুধু শুষ্ক রাজনীতিই নয়—বেশ সরস, উপাদেয়। তবু এই ভালো—ট্রেনের এই আবহাওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কূটতর্ক বরদাস্ত হত না।

গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—অন্ধকূপ হত্যার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দরজায় জানলায় সশব্দ আঘাতের বিরাম নেই। সমস্ত কোলাহল ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে বাইরে কে কাতরকণ্ঠে ডেকে ফিরছে: সুবোধ, সুবোধ কোথায় গেলিরে? ও সুবোধ?

দরজার কাছে কার বিপন্ন মিনতি: খোল্ দিজীয়ে—মেহেরবাণী করকে খোয়া খোল্ দিজীয়ে—

—নেহি—নেহি—

—মর জায়েগা, বালবাচ্চা মর জায়েগা—

—মরনে দেও। যে অবস্থা হয়েছে দেখছ না? কে কাকে বাঁচাতে পারে বাবা?

ছোট ছেলেটি মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে এখনো—ধমকাতে ধমকাতে পুরুষটি হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথবা হয়তো যোগ দিয়েছে রাজনীতির উত্তপ্ত আলোচনায়। অতুল-বৌদির বিলাপের বিরাম নেই। দেবর অশ্রান্তভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে: কেন ভয় পাচ্ছ? যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে পালিয়ে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে? কলকাতা থেকে রংপুর আর ক' ঘণ্টার পথ! তাছাড়া অতুলদা তো হুঁশিয়ার মানুষ—সব ঠিক হয়ে যাবে বৌদি।

ঢং ঢং। বাইরে ঘণ্টা বাজল। ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসল আদিত্য। গাড়ি ছাড়লে জানালা খুলবে—হাওয়াও আসবে দু-চার ঝলক।

—যাক, বাঁচালে বাবা।

বন্ধ দরজা-জানলার বাইরে শেষ আকুতি। ওদিকে কোথায় আর একখানা কাঁচ ভাঙল। আর একদফা গালাগালি উঠল উত্তাল হয়ে। সবাই পালাতে চায়, সবাই বাঁচতে চায়। কাউকেই দোষ দেওয়া চলে না।

বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল গাড়ি। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে দিলে। হঠাৎ শোনা গেল: গেল, গেল!

কে গেল—কোথায় গেল, কে জানে। হয়তো কোনো গাড়ির হাতল থেকে সোজা চাকার নিচে, অথবা প্ল্যাটফর্মের ওপর। তা যাক—কারো জন্যে কিছু ভাববার সময় নেই—নিজের কথা ভেবেই এখন থই পাচ্ছে না মানুষ। স্বার্থপরতা? ভালো ভালো কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে অর্থটা তাই হয়েই দাঁড়াবে বই কি। কিন্তু জীবন তো শুধু ভালো কথাই নয়—বেঁচে থাকার নামই জীবন। সেই বাঁচাটা যে কত শক্ত, আজ তা মানুষ অস্থি-মজ্জায় টের পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে ওরা টের পেয়েছে, ভালো কথা বলবার বা শোনবার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। অন্তত দুর্দিনের আকাশে যখন জাপানী বোমার আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই লগ্নটা পরার্থপরতার অনুকূল অবকাশ নয়।

ট্রেন বেরিয়ে এসেছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। ঝরাং ঝরাং করে দুপাশের কাচ আর কাঠের জানালাগুলো খুলে যেতে লাগল—বাইরে থেকে ছুটে এল শীতার্ত রাত্রির হাওয়া। কিন্তু বাতাসটাকে তেমন তীব্র বলে মনে হল না; এতক্ষণ ধরে গরমে সেদ্ধ হওয়ার পরে যেন এরই প্রয়োজন ছিল। অন্ধকারের ভেতরে একে একে ছিটকে সরে যেতে লাগল নানা রঙের অসংখ্য আলো, এঞ্জিনের সার্চ লাইট, লোকো শেড্ থেকে বয়লারের রক্তিমাভা।

অনিমেষের জন্যে সমস্ত মনটা উদ্বিগ্ন আর বিষণ্ণ হয়ে আছে। কী যে ঘটেছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। যুদ্ধের সময়। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য-বাদ ভয়চকিত হয়ে যেন অপমৃত্যুর প্রহর গুণছে। আমাদের যা করবার তা করতে হবে এখনি। হাতে হাত মেলাও ভাই, কাঁধে কাঁধ মেলাও। আদায় করে নাও যা তোমার পাওনা। কল-কারখানার হাতুড়িতে, ধানের ক্ষেতের কাস্তের মুখে প্রতিষ্ঠা করো তোমার দাবী-দাওয়াকে। অনেকবার অনেক ভুল করেছো—আর নয়। কিন্তু অনিমেষের কী হয়েছে কে জানে। চা-বাগানওয়ালাদের অসাধ্য কাজ সংসারে নেই কিছু।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল।

সামনের সীটে একটু এগিয়ে কে বসে? লোকটাকে যেন চেনা চেনা ঠেকছে না?—হাঁ, চেনা লোকই বটে, শশাঙ্ক।

—শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক চমকে মুখ ফেরালো। আদিত্যের দিকে চোখ পড়তেই সে যেমন ম্লান, তেমনি বিমর্ষ হয়ে গেল। মুখের ওপরে একটুকরো কৌতুকের হাসি খেলা করে গেল আদিত্যের।

—কোথায় চলেছো শশাঙ্ক?

—রাজসাহী।

—রাজসাহী? রাজসাহী কেন?

শশাঙ্ক নিরুত্তর। মনে হল কী একটা কথা বলবার জন্যে নিজের ভেতরে সে অসহায়ভাবে খাবি খাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

—পালাচ্ছ তাহলে?

মিথ্যে বলতে পারলে সুখী হত শশাঙ্ক, কিন্তু বলতে পারল না। আদিত্যের নীল চোখ থেকে খানিকটা বিদ্যুতের মতো তীব্র একটা কিছু এসে তার গায়ে বিঁধছে। হঠাৎ শশাঙ্ক টের গেল বেঞ্চের ভেতর বড্ড বেশি ছারপোকা, তাকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছে।

—না, ইয়ে তা নয়, তবে বাবা লিখলেন কিনা—

আদিত্যের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ফুটে বেরুল: পিতৃভক্তির জন্যে এত সুনাম তো তোমার ছিল না। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কলকাতা হাওয়ায় উড়ে গেলেও এখানেই তুমি পড়ে থাকবে। তা প্রতিজ্ঞার চাইতে পিতৃ-আজ্ঞাটাই বোধ হয় বেশি হয়ে উঠল?

শশাঙ্ক তাকিয়ে রইল। অসহায়ভাবে—মূঢ় একটা নির্বোধ জানোয়ারের মতো। যেন আত্মসমর্পণ করে বসে আছে—যেন করুণা ভিক্ষা করছে

আদিত্যের। সদর রাস্তা হলে ছুটে পালিয়ে যেত, কিন্তু এখানে ট্রেনের জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

যে ভয় করছিল, সেই প্রশ্নটাই এল শেষ পর্যন্ত।

—শীলার কী করলে ?

—কী আবার করব ?—অনেকটা যেন মরিয়া হয়েই জবাব দিলে শশাঙ্ক ?

—কী করবে ? আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি। নিজে তো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছ, তাকে কার কাছে রেখে এলে ?

—তার—তার মাসিমার কাছে।

—বাঃ, চমৎকার।—আদিত্য হেসে উঠল : চমৎকার। তোমার জন্যে সে বেরিয়ে এল ঘর-বাড়ি ছেড়ে, বাপ-মায়ের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারল, আর তুমি তাকে মাসিমার কাছে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছ ?

—কী করব ?—মুখ চূর্ণ করে শশাঙ্ক বললে : বাবার কাছে নিয়ে গেলে বাবা আমাকে শুদ্ধ্ বাড়ি থেকে বার করে দেবেন। আপনি বাবার মেজাজ জানেন না আদিত্যদা।

এবার ঘৃণায় আদিত্যেরও আর কথা বেরুল না। কী কাপুরুষ—কী ইতর! শীলা ওর জন্যে সর্বস্ব ফেলে বেরিয়ে এসেছে—নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎকে দু-হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর সেই শীলাকে আজ আসন্ন বোমার অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে শশাঙ্ক—আকস্মিকভাবে পিতৃভক্ত হয়ে-ওঠা কাপুরুষ স্বার্থপর শশাঙ্ক। যুদ্ধের কালো বিষ আজ ওর রক্তকেও জর্জরিত করে দিয়েছে, আজ ওর চেতনার প্রান্তে প্রান্তে নেচে বেড়াচ্ছে আদি মানবতার দানবীয় প্রেতচ্ছায়া!

দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে চাপা গর্জন বেরুলো আদিত্যের। নীল চোখ যেন জ্বলে যেতে লাগল : যাক—বেশ করেছো।

—আমি, আমি বাবার সঙ্গে একটু দেখা করতে যাচ্ছি। তিন চার দিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় ফিরে আসব।

—হুঁ।

আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না আদিত্যের। শশাঙ্ক মিথ্যা কথা বলছে—অনিবার্যভাবেই মিথ্যা কথা বলছে। তার জন্যে কোনো প্রমাণ প্রয়োগেরই দরকার নেই। তার চোখ-মুখ, তার সন্ত্রস্ত ভঙ্গি সব কিছু এক সঙ্গে বলে দিচ্ছে, শীলার প্রতি প্রেমের চাইতে তার আরো বড় তাগিদ আছে—সে জৈবিক তাগিদ, প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ। একটু আগেই যে কথাটা ভাবছিল আদিত্য। নিজেকে ভালোবাসে বলেই সব কিছুকে ভালোবাসে মানুষ। প্রেমে, স্নেহ, বন্ধুত্ব এথিক্‌সের সব তত্ত্বগুলো এরই কষ্টিপাথরে নির্ভুলভাবে যাচাই হয়ে যায়; শশাঙ্কের দোষ নেই।

শশাঙ্কও মুখ ফিরিয়েছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—আদিত্যের নীল তীক্ষ্ণ চোখের সঙ্গে দৃষ্টি মেলাবার সাহস তার নেই! এক আধটা নয়—সবগুলো কথাই মিথ্যে বলেছে সে। শীলাকে সে মাসিমার বাড়িতে রেখে আসেনি, কলকাতায় শীলার মাসিমা কেন, কোনো আত্মীয়ই যে নেই একথা আদিত্য না জানলেও শশাঙ্ক জানে। চোরের মতো রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে শশাঙ্ক—একা ঘরে ঘুমের ঘোরে হয়তো এখন তাকে বিছানায় হাতড়ে ফিরছে শীলা। কাল নির্বান্ধব নিঃসহায় কলকাতায় তার কী হবে সে কথা ভাববার মতো মনের অবস্থা নয় শশঙ্কের। একটা বোকা রোমান্টিক মেয়েকে নিয়ে দিনকয়েক প্রেম করা চলতে পারে, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে তার সঙ্গে হত্যা করা চলে না, নষ্ট করা চলে না বাবার অতবড় জমিদারীটাকে। পৃথিবীতে শীলা একমাত্র নয়—অসংখ্য; আর এই অসংখ্য শীলারা আছে বলেই শশাঙ্কদের জীবনে বৈচিত্র্য আছে—রোমাঞ্চ আছে। অনেকদিন ধরেই যা তার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছিল, আজকের এই

উপলক্ষ্যটাকে অবলম্বন করে সেটাকে ঝেড়ে ফেলেছে শশাঙ্ক—মুক্তি পেয়েছে। শীতের বাতাস নাসারন্ধ্র ভরে বুকের মধ্যে টেনে নিতে লাগল সে—আঃ। বাইরের দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার আর অবারিত আকাশের রাশি রাশি তারায় তারায় তার মুক্তি যেন প্রসারিত হয়ে গেছে। আদিত্যের নীল চোখের আগুন এখনো তাকে অস্বস্তির কাঁটায় পীড়িত করে তুলছে বটে, কিন্তু এ আর কতক্ষণ।

ওদিকে নিবে যাওয়া চুরুটটাকে আবার ধরিয়েছে আদিত্য। হঠাৎ মনের সামনে ভেসে উঠেছে স্টেশনে আসবার পথে ভুল করে ঢুকে পড়া হাড়-কাটা গলির কথা। আধা-অন্ধকারে—অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকারে দেহ-পসারিণীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কেন যেন মনে হল ওদের দলে একদিন শীলাকে দেখতে পেলেও সে আশ্চর্য হবে না।

আর ল্যাম্প-পোস্ট ধরে টলছে মাতাল হেমন্তবাবু।

—পালান, পালান আপনারা। আপনাদের দামী জীবন, বাঁচতে হবে। কিন্তু আমরা এখানকার আবর্জনা, এই আস্তাকুঁড়ে মরবার জন্যেই জন্মেছি। যদি বোমায় উড়ি তো পাঁচাকে আঁকড়ে নিয়েই উড়ব। সুখের পায়রা আপনারা—মানে মানে সরে পড়ুন।

মানে মানে সরেই তো যাচ্ছে সব। সুখের জন্যে যাদের বলি দেওয়া হয়েছে, যাদের নিঃশেষে নিষ্পেষিত করা হয়েছে, তারাই পড়ে থাকবে, তারাই শ্মশানে জাগিয়ে রাখবে কঙ্কালের বাসর। আজ তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে —আজ আর তাদের কেউ চায় না। যারা স্বর্গের অধিবাসী—স্বর্গে তারাই যাবে, তাদের পবিত্র এঁটো পাতা ধুলোয় পড়ে থাকবে—হাওয়ায় উড়বে।

কিন্তু শীলা। অমন ফুলের মতো মেয়েটা। জীবনে এমন ভুল কেন করল—কেন শশাঙ্কের মতো এমন একটা অপদার্থকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বসল। এ যে কতখানি অপাত্রে দান হচ্ছে, শীলার মতো এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে তা কি

এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারেনি! আজ শশাঙ্ক পালিয়ে যাচ্ছে—প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। পুরুষ মানুষের জীবনে ভুল দু'চারবার হয়েই থাকে—সেজন্যে কেউ ওকে অপরাধী করবে না।—নিজের হারানো অধিকারে আবার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হবে শশাঙ্ক। কিন্তু শীলা? শীলার কী হবে?

গাড়ির ভেতরে কোলাহল চলেছে, তর্ক চলেছে, কান্নাকাটি চলেছে, কদর্য গালাগালি চলেছে, গান আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ চলছে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে একটি সুর—সীমাহীন ভয়, আকুল অসহায়তা আর অন্ধ জৈবিক তৎপরতা। এ কিসের রূপ? মনে হল: যেন ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ একটা মূর্তি খণ্ডাংশ হয়ে এই কামরাটার ভেতরে এসে দেখা দিয়েছে। শতাব্দী-সঞ্চিত গ্লানি আর অপমানের বিকারে বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ অলক্ষ্য নিয়তির শাসনে ছুটে চলেছে—কোথায়—কোন্‌দিকে—জানে না।

আজ যুদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম—দেশে দেশে মানুষের হাতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। এদের হাতে সেই অস্ত্র থাকলে জন-যাত্রার ধারা কি বদলে যেত না? পলায়ন কি সেদিন হয়ে উঠত না অগ্রগামী সংশপ্তকের মুক্তি অভিযান?

জানলার বাইরে থরে থরে অন্ধকার। কল্যাণতম রূপের পাত্র অপাবৃত করে কবে সেখানে দেখা দেবে সবিতা—জ্যোতির্ময় হিরণ্য-পাণির সূর্য-সারথি কোন তমসা-তীর্থে সেই শুভযোগের প্রতীক্ষা করে আছে?

পাঁচ

দেখতে দেখতে সুমিতার চারতলা বাড়িটা প্রায় ভরে উঠল।

যেখানে যেসব ছেলেরা ছড়িয়েছিল, তারা তো এলই, মেয়েরাও বাদ গেল না। আর এতগুলি ছেলেমেয়ের কর্তৃত্ব করার ভার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল সুমিতার ওপরেই। কিন্তু কর্তৃত্ব করা কি সহজ? দিনের বেলা অবশ্য খুব বেশি অসুবিধা হয় না। আটটা নটা বাজতে না বাজতে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে নিজের এলাকায়। কেউ কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নেয়, কেউ বা রেশনের থলে। বইতে আর কাগজপত্রে সেগুলোকে একেবারে ঠাসাঠাসি করে ভরে৷ নেমে পড়ে রাস্তায়।

তারপর বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে সারাদিন। প্রায় নির্জন কলকাতার বুকের ওপর নামে আরো নির্জন দ্বিপ্রহর। শীতের চাঁপাফুলী রৌদ্রেও সামনের পীচ জ্বলতে থাকে—কোলাপ্‌সিবল গেটে বড় বড় ভারী তালা আঁটা বাড়িগুলোকে যেন ভূতড়ে বলে মনে হয়। সুমিতার বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ থাকে না। মেয়েরা নিজেদের ঘরে পড়াশুনো করে, রিপোর্ট তৈরি করে, পোস্টার লেখে। শুধু বাতাসে কোনো খোলা জানালা থেকে কট কট করে শব্দ ওঠে, কোথাও বা গঙ্গাজলের কল থেকে ছর ছর করে অবিশ্রান্ত জল পড়ে।

ঠিক এই সময়টাতে সুমিতার কিছু ভালো লাগে না। নিজের মনটাকে ভারী অপ্রস্তুত, ভারী নিরবলম্ব, ভারী অসহায় বলে বোধ হয়। এত কাজ আছে, এত দায়িত্ব আছে। সমস্ত জীবনটাকে ছবির মতো সামনেই তো দেখতে পাওয়া যায়। দুস্তর কঠিন পথ। বিঘ্ন, বাধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস।

মাঝে মাঝে নিজের শক্তির ওপরেও সংশয় আসে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, অপেক্ষা করবার উপায় নেই। দিগ্‌দিগন্তে প্রচণ্ড ধ্বনি-তরঙ্গ জাগিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। আর সেই রথের দড়ি ধরে টানছে গণ-জনতা। তার সামনে থেমে দাঁড়ানো তো চলবে না। হয় রথের দড়ি টানো, নতুবা জন-জগন্নাথের জয়রথের চক্রতলে চূর্ণ নিষ্পিষ্ট হয়ে যাও। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, গত্যন্তর নেই কিছু।

আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্কে বিহ্বল ব্যাকুল কলকাতা। সব বিশৃঙ্খল, সব অসংলগ্ন। কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন কিসের একটা সুতীক্ষ্ণ সংকেতময়তা, একটা অনিবার্যতার ইঙ্গিত। নিজের রক্তের মধ্যে সুমিতা শুনতে পায় রথচক্রের গর্জন। অসছে—আসছে—তার আর দেরী নেই। আকাশে ঝড়ের মেঘ উড়েছে, সেই মেঘের বুকেবিদ্যুতের রক্ত-শিখায় লকলক করে যাচ্ছে তার রক্ত পতাকা। দুপুরের বাতাসে বিচিত্র শব্দ বাজে—মনে হয় কোথাও দৃষ্টির অগোচরে—কোনো একটা নেপথ্যলোকে কারা যেন লক্ষ লক্ষ তরোয়ালে শান দিয়ে চলেছে; তাদের দিন আসছে, তাদের প্রবল প্রচণ্ড মুহূর্ত আসছে ঘনিয়ে। এই যুদ্ধ শুধু এশিয়া-ইউরোপে খানিকটা বিচ্ছিন্ন রক্তপাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না। বদলে দেবে লক্ষ কোটি মানুষের চিরাচরিত অপমানের ইতিহাস, নতুন করে গড়ে তুলবে আর এক পৃথিবী। সার্থক এবং পরিপূর্ণ, বিপুল এবং বিরাট।

কিন্তু তবুও নির্জন দুপুর। ঘরে বাইরে একটা আশ্চর্য শূন্যতা। সেই শূন্যতা যেন চেতনার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনিমেষ আর আদিত্য, আদিত্য আর অনিমেষ মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। বহুদূরে কোথায় সমুদ্রের নীল-তরঙ্গ প্রতিহত হচ্ছে গ্র্যানাইটের শৈল-সিকতায়। বাতাসে নারিকেল-বীথির মর্মর, ঈজিয়ানের সমুদ্র। পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ইংরেজ কবির এলোমেলো কবিতার লাইন। অনিমেষ কোথায়, অনিমেষ কতদূরে?

এইসব কবিতাগুলো কখনও কি তার মনে পড়ে না? সমুদ্রের জল হীরার মতো ঝলমল করছে। কিরণবর্ণা অ্যাটলান্টা কি চিরদিনের জন্যেই তার আড়ালে তলিয়ে গেল, আর কোনোদিন উঠে আসবে না? সৈনিকের জীবনে কি একটি মুহূর্তও নেই, নেই এতটুকুও অবকাশ?

দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল আসে। চব্বিশটা ঘরের ওপর দিনান্তের মলিন ছায়া ঘনাতে থাকে। তারপর চব্বিশটা ঘরে একটার পর একটা আলো জ্বলে ওঠে। ছেলেরা ফিরে আসে।

আর নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকবার সুযোগটুকুও ফুরিয়ে যায় সুমিতার।

বড় একটা কেটলিতে চায়ের জল ফোটে। ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসে তার চারপাশে। কাচের গ্লাস, মাটির ভাঁড়, হাতল ভাঙা পেয়ালা, যে যা পারে যোগাড় করে নিয়ে বসে। তর্ক চলে, আলোচনা চলে।

—লেবারকে মবিলাইজ করতে গেলে আগে ওদের লিটারেচার ভালো করে পড়ানো দরকার। অন্তত একটা ক্ল্যারিটি অব্ ভিসন—

—আমার কিন্তু মনে হয় খাঁটি থিয়োরী ওদের মনে সাড়া দেবে না। ওরা কাজ বোঝে, কথা বোঝে না।

—আহা সে তো বটেই, সেটা কে অস্বীকার করছে। আমরা তো ওদের বক্তৃতা দিয়েই উদ্ধার করে দিচ্ছি না। বক্তৃতায় কাজ হলে তো সুরেন বাঁড়ুয্যের আমলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত। আসল কথা ওদের বোঝানো দরকার কিসের জন্যে ওরা লড়ছে, কেমন করে ওরা লড়বে।

—বেশ তো সেটাই বোঝাও!

—বোঝাচ্ছি তো নিশ্চয়ই। সেই সংগে ভেস্টেড্ ইন্টারেস্টের শিকড়টা কোন্ অবধি গিয়ে যে পৌঁছেছে, সেটাও ভালো করে পরিষ্কার করে দেবার দরকার আছে তো। তাই বলছিলাম লিটারেচারটা কিছু কিছু পড়ানো ভালো।

—কিন্তু সেটা সকলের জন্যে নয়। ওতে অনর্থক সময় নষ্ট, উৎসাহেরও অকারণ অপব্যয়। এটা তো মানো, কোনো কাজে সবাই-ই লীড্ নিতে পারে না, মাত্র দু একজনকেই সে দায়িত্ব নিতে হয়?

—মানি।

—আর এও নিশ্চয় মানো, পিপ্‌লের সামনে যে বাস্তব সমস্যাগুলো আসে, তাকেই তারা একমাত্র স্বীকার করে? ফাঁকা আদর্শের মূল্য কী, বলো? আমাদের ন্যাশন্যাল স্টাগল থেকে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। স্বাধীনতা আন্দোলন আমরা বারে বারেই তো করেছি। দেশের সবাইকে ডাক দিয়েছি, মধ্য-বিত্তকে, শ্রমিককে, কৃষককে। কিন্তু ফল কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত? আমরা বন্দেমাতরম্ বলে আহ্বান জানিয়েছি, তারাও ছুটে এসেছে। জেলে গেছে, নির্যাতন সয়েছে, পিটুনী ট্যাক্সের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে। তার পরের ইতিহাস দেখো। আমরা যারা উকিল, তারা আবার আদালতে ফিরে এসে 'ইয়োর অনার' বলে সওয়াল করেছি, যারা ছাত্র তারা আবার ইস্কুল, কলেজে ফিরে গিয়ে অধ্যয়নের তপস্যায় মন দিয়েছি, যারা জমিদার তারা 'এ' ক্লাস প্রিজনার হয়ে সসম্মানে জেল খেটে আবার এসে যথানিয়মে জমিদারী করেছি। কিন্তু একবার ভাবো কৃষকের কথা। কী লাভ হয়েছে তার, এ থেকে সে কী পেল?

অপর পক্ষে এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে : তা হলে তুমি কি করতে বলো?

—যা করতে বলি, তা এই। ওদের রাতারাতি বিদ্বান করতে চেয়ো না। মোটা প্রয়োজনগুলো মোটা কথায় ওদের বুঝিয়ে দাও, যদি কাজ হয় তো তাতেই সব চাইতে বেশি হবে।

—তুমি কি মনে করো দশ বছর আগে আমাদের যে পলিটিক্যাল লাইন অব্ অ্যাক্‌টিভিটিজ ছিল, আজো তাই আছে? আজকের লিটারেচার শুধু কতগুলো কথার সমষ্টি নয়, তা প্র্যাকটিক্যাল।

তর্ক চলে, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সবাই উত্তপ্ত বোধ করে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে চলে চা। দুধ-চিনির মাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে আর উদ্দীপনাও বেড়ে উঠতে থাকে সমান তালে।

গল্প করে, হাসি ঠাট্টা করে। এক পাশে দু-তিনজন মিলে ঘরোয়া আলোচনা চালায় চাপা গলাতে। কেউ নিজের ঘরে বসে চুপচাপ করে পড়ে, কেউবা লেখে। তারপর আলোচনায় যখন ছেদ পড়ে, সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, তখন সুমিতা মধ্যস্থতা করে। বলে, আর তর্ক নয়—ওসব কচকচি এখন থাক। এখন কাব্যপাঠ হোক।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র অল্পবয়সী একটি ফর্সা ছেলের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে সে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। রমলা বলে, সুমিতাদি, ইন্দু কিন্তু পালালো।

সুমিতা হাসে, না, না, কবি পালালে চলবে না। এবারে তোমার পালা, রাজনীতির এই মরুভূমিতে তুমি কবিতার মরূদ্যান দু চারটে জাগিয়ে তোলো দেখি। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

ইন্দু যেন লজ্জায় আরো ছোট হয়ে যায়। একটু আগেই এই ছেলেটি যে রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে হাতাহাতির উপক্রম করেছিল, একথা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা চলে না।

ইন্দু বলে, না, সুমিতাদি।

—না কেন? সভার সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কই, পকেট থেকে বার করো খাতা। একটা গরম গরম কিছু শুনিয়ে দাও দেখি।

ইন্দু প্রাণপণে কী বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু চারদিকের প্রবল কোলাহলে তার গলার স্বর হারিয়ে যায় অসহায়ভাবে। কবিতা শোনবার জন্যে সকলের মন যে একেবারে হাহাকার করে উঠেছে তা নয়। দুর্দান্ত তার্কিক এবং পরম

সপ্রতিভ ইন্দুর এই বিপন্ন অবস্থাটা সকলের কাছে ভারী উপভোগ্য বলে বোধ হয়। বিশেষ করে তর্কে যারা হেরে গেছে, তাদের গলাই আরো বেশি জোরালো হয়ে ওঠে।

জলে-ডোবা মানুষের মতো ইন্দু অবশেষে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ টেনে বার করে। একবার শেষ চেষ্টা করে বলে, এ কবিতাটা ভালো হয়নি।

উল্লসিত চিৎকার ওঠে: না, না, চমৎকার হয়েছে। পড়ো কবি, শোনাও আমাদের।

আর উপায় নেই। ইন্দু শেষবারের মতো সকলের মুখের দিকে—কিন্তু কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। এমনকি, সুমিতারও না। অতএব নিরুপায় হয়ে কবিতা পড়তে শুরু করে।

প্রথমে ভীরু, তারপর ক্রমশ গলার স্বর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে, উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ইন্দু কবিতা পড়তে শুরু করে:

> হংস-মিথুন, নীড়ের ঠিকানা কই
> অসীম সাগর দুলিছে পাখার নিচে,
> ছুটেছ কোথায় কোন্ মরীচিকা পিছে
> পথের সঙ্গী আমরা তো কেহ নই—

একজন মন্তব্য করে: এখনো হংসমিথুনের কবিতা!

সুমিতা বলে, চুপ। বে-রসিকের মতো আগে থাকতেই টিপ্পনী কাটতে যেয়ো না।

> হংস-মিথুন, দেখো দিগন্ত-তলে
> মেঘের মতন কামানের ধোঁয়া জমে,
> আলোর আভাস দেখে কি পড়েছো ভ্রমে?
> আগুনে বোমায় মারণ-যজ্ঞ চলে।

এইবারে সকলে চুপ করে যায়। হংস-মিথুন নীড় হারিয়েছে। কবিতার

ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইন্দু বলে চলে, বিলের বুকে বুনো কলমী ফুলের আড়ালে-আড়ালে তোমাদের যে মিলন-বাসর, আজ সেখানে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। আজ বন্দুক হাতে এসেছে শিকারী, তাদের সাথে সাথে এসেছে লোল জিহ্বা ঝুলে-পড়া হিংস্র শিকারী কুকুরের দল। আজ আর নিস্তার নেই, রক্ষা নেই কারো। তোমাদের স্বপ্নাতুর বাসক রজনী অপমৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল :

হংস-মিথুন, এখনো সে দিন নয়,
হাঁকিছে শিকারী, ডাকিছে যুগের শিখা,
কোনো আলো নেই, নেই কোনো সান্ত্বনা,
বধির স্বর্গে ভাষাহীন প্রার্থনা,
দেবতার বেদী বলির রক্তে লিখা
লোভী পুরোহিত জাগিছে বিশ্বময়—

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইন্দু থেমে যায়। কবিতা থামে, তার রেশ হারায় না। সকলে চুপ করে বসে থাকে। এত বস্তুবাদী এরা,এত বুদ্ধিবাদী, তবু কারো সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে না। কবিতা ভালো কি মন্দ সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তার দোলাটা বাজছে রক্তের মধ্যে, তার ছন্দটা যেন মর্মরিত হয়ে উঠেছে শিরায় শিরায়।

খানিক পরে একটি দুটি করে কথা বেরুতে থাকে।

—বাঃ, বেশ হয়েছে।

—মন্দ হয়নি তো কবিতাটা।

—নাঃ, কবির হাত আছে সেটা মানতেই হবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতবর্ষে ইন্দুই নব-জীবনের গান গাইবে।

বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধিও সজাগ হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে।

—তবে প্রকাশ-ভঙ্গিটা এখনো গতানুগতিক।

—আরো স্ট্রেট্, মানে আরো তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। ইন্দুর বুদ্ধি যতটা ধারালো হয়ে উঠেছে, মন ততটা নয়। ওর ভেতরে একটা ডুয়্যালিটি আছে। বাইরে ও ভয়ঙ্কর যুক্তিপন্থী, কিন্তু মনে রোমান্স একেবারে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে।

—তবু চেষ্টাটা ভালো।

—নিশ্চয়। তবে আরো সজাগ মন চাই। এখনো হংস-মিথুনের জন্য বিলাপ করছে। কিন্তু পুরোনো নীড়ের ঠিকানা যদি না-ই থাকে, তা হলেই বা এত কাতর হবার কী আছে! নতুন নীড় খুঁজে নিতে হবে, নতুন করে বাঁচতে হবে।

—হংস-মিথুন পরাজয়ের মধ্যেই তলিয়ে যাবে কেন? তারও দিগন্ত আছে —আরো বিস্তীর্ণ পৃথিবী আছে। কবি, সেই বৃহত্তর পৃথিবীরই জয়গান করো।

—ঠিক কথা। 'কবি তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ'—

ইন্দু উত্তর দেয় না। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নিজের ঘরে উঠে চলে যায়। কোন সমালোচনায় সে কখনো জবাব দেয় না, যে যা বলে, নীরবেই শুনে যায় চিরকাল।

বাইরে রাত বাড়ে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ট্রাফিকের স্রোতে মন্দা পড়তে থাকে। রান্নাঘরের তত্ত্বাবধানে যারা ছিল, তারা এসে খবর দেয়, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, এবার বৈঠক ভাঙতে পারে।

খাওয়ার ঘরেও তর্ক আর আলোচনা চলে পুরোদমে। মাঝে মাঝে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাও ওঠে।

—উঃ, মাণিকতলার বস্তিতে কী দিনগুলোই গেছে ভাই।

—আর ইঁদুরগুলো? এক একটা যেন বাচ্ছা শূয়োরের মতো দেখতে। সারারাত ঘরে কী গণ্ডগোল যে করত! সুরেশদার পায়ে কামড়ে দিলে সেবার, একটু হলে চাই কি একটা আঙুলই কেটে নিয়ে যেত।

—নাঃ, এখানে রাজার হালেই আছি বলে মনে হচ্ছে। একেবারে রাইট্ রয়্যাল! স্বাধীন ভারতে আমরা সুমিতাদিকে জন-খাদ্য-বিভাগের প্রেসিডেন্ট করে দেব।

সুমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, থাক, অত অনুগ্রহে দরকার নেই।

—অনুগ্রহ মানে? ভোটের জোরে করে দেব—দেখবেন।

—সত্যি বড্ড খাওয়া হচ্ছে। এরকম খাওয়া-দাওয়া হলে ক'দিন বাদে আয়েসী হয়ে পড়ব, বাড়ি ছেড়ে আর নড়তে পারব না।

সুমিতা বলে, যাও না তোমরা সব বাড়ি ফিরে। ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমার হাড় আর জ্বালিয়োনা।

খেতে খেতেই একজন গান জুড়ে দেয়:

"যাবোনা আজ ঘরে রে ভাই,
যাবোনা আর ঘরে—"

সকলে মুহূর্তে তাকে থামিয়ে দেয়।—থাম, থাম্ বাপু, তোকে আর তেওট তালে হালুম্ব-বাগিণী ভাঁজতে হবে না। বিষম লাগিয়ে এমন খাওয়াটা একেবারে মাটি করে দিলি দেখছি।

এমন খাওয়া! তাই বটে। সুমিতার মনটা হঠাৎ ছল ছল করে ওঠে। কত অল্পে এরা খুশি, কত সামান্য আয়োজনে এরা পরিতৃপ্ত! অথচ, এরা সবাই যে গরীবের ঘরের ছেলে তা নয়। ভালো খাওয়া-দাওয়া কাকে বলে তা এদের অজানা নেই। কিন্তু যে পথে আজ এরা নেমে এসেছে, তার দাবীতেই মুছে ফেলেছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে এত অভ্যাস, এতদিনের সংস্কার।

কী খেতে পায় এখানে? একটুকরো মাছ, একটুখালি ডাল, আর কোনোদিন বা একটু তরকারী। তাতেই খুশির সীমা নেই, যেন রাজভোগ খাচ্ছে। ওরা মুখে যা কিছু তর্ক করুক, যা কিছু বলুক—জীবনের লক্ষ্য ওদের বাঁধা। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কঠিন পৃথিবী ডাকছে. ডাকছে

কঠিনতর কর্তব্য। নতুন মানুষ, নতুন জগৎ। সেই নতুন মানুষদের না আনা পর্যন্ত—সেই নতুন জগৎকে সৃষ্টি করে না তোলা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই—দাঁড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই।

দুশো বছরের পরাধীনতার অভিশাপ। দুশো বছরের কালো অন্ধকার জাতি আর দেশের বুকের ওপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেই পাথরকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে। উদয়-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে সেই লগ্নের জন্যে—যেদিন দিক-চক্রে তিমিরহারী সূর্যের বাণী বয়ে দেখা দেবেন সূর্য-সারথি।

তারই প্রতীক্ষা, তারই সাধনা বস্তির বিষাক্ত অবরোধে, কারখানার ধোঁয়া আর আগুনে, খর রৌদ্রে দিগ্‌বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে। তিলে তিলে নিজেদের জীবনকে ক্ষয় করে ওরা মহাজীবনের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে।

কতদিন খাওয়া জোটে না, শোবার জন্যে এতটুকু জায়গা পর্যন্ত জোটে না। দু একজনের সাস্‌পেক্টেড টি বি, কেউবা ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। সাধারণের চোখে ওরা শহীদের সম্মান পাবে না, ফুলের মালাও নয়। ওরা বক্তৃতা দেয় না, সভা-সমিতি করেও বেড়ায় না। তাই ওদের নাম নেই. কোনোখানে তাই কেউ ওদের চেনে না। যেদিন মরবে সেদিনও unwept, unlamented, unsung, মহাজীবনের যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণের হবি-বিন্দু মুহূর্তে ছাই হয়ে মিলিয়ে যাবে!

—বাঃ, কী চমৎকার ডালটা। কতদিন পরে এমন ডাল জুটল বল দেখি?

—যাই বলো, জগদ্দলের সেই হরবন্‌শীর মা খাসা অড়োরের ডাল রান্না করে। মোটা রুটির সঙ্গে সেই ডাল একদিন খেলে তিনদিন পেট ভরে থাকে ভাই।

অকারণেই সুমিতার চোখে জল আসে।

রাত বারোটা বেজে গেল।

যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিন খেটে এসেছে,—এখন ঘুমোচ্ছে একেবারে কুম্ভকর্ণের মতো। শুধু দুচারজন এখনো আলো জ্বেলে পড়াশুনো করছে। আর, ঘুম নেই সুমিতার চোখে।

ইন্দুর কবিতার লাইনগুলো মনের কাছে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কবিতা কার? শুধু কি ইন্দুর, না সুমিতারও?

হংস-মিথুন, এখন সেদিন নয়;
বিলের বুকেতে বুনো কল্‌মির ফুল।
বিভোর স্বপ্নে প্রহর হয়েছে ভুল—
কালের আঘাতে সে মোহের হলো লয়।—

হংস-মিথুনের মতো নীড় ভাঙল কাদের? অনিমেষের আর সুমিতার? দেশের আরও বহু মুগ্ধ বিহ্বল প্রেমিক-প্রেমিকার? স্বপ্ন দেখছিল তারা, একটা মধুর আবেশের মধ্যে পড়েছিল মূর্ছিত হয়ে। কিন্তু এল আঘাত—এল নিষ্ঠুর কাল। কোথা থেকে নির্মম বাণ এসে বিঁধল অ্যাডোনিসের বুকে—ঈজিয়ানের হীরা-মাখানো জল রক্তে লাল হয়ে গেল।

একদিনের কথা মনে পড়ল।

সে সব তো দিন নয়, কতগুলো বুদ্বুদ যেন। ইন্দ্রধনু-রাঙা সাবানের বুদ্বুদ। তাই বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে গেল তারা—কোথাও বিন্দুমাত্রও চিহ্ন এঁকে রেখে গেল না তাদের। সেদিন ঝড়ের বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছিল ওরা জি, টি রোড দিয়ে। হঠাৎ ঝাঁ করে একটা কুকুর পড়ল সামনে, চ্যাপটা হয়ে গেল চক্ষের পলকে।

সুমিতা সখেদে 'আহা' বলেছিল, কিন্তু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলেছিল অনিমেষ। তার সে আকুল-কান্না আজও মনের ভেতরে গুমরে বেড়াচ্ছে সুমিতার।

অথচ সেই অনিমেষ আজ কী হয়ে গেছে। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে সে।

কিন্তু ফুলের পথ দিয়ে সে আসবে না, কোনো দেশে আসেওনি। রাঙা মেঘে রক্ত-ঝরা দিনই তো তার পরম আবির্ভাবের চরম-লগ্ন; কঙ্কাল-করোটির অক্ষমালায় তার প্রহর গণনা, তার তপস্যা ছিন্নশির শবের ধ্যান-পীঠিকায়।

মৃত্যু হয়েছে অ্যাডোনিসের। তা হোক। আজ যুদ্ধ-কুঠার কাঁধে রণ-দেবতা মার্সের পদসঞ্চার। চাঁদে উঠেছে আগ্নেয়-ঝড়।

নিচে নিঃশব্দ রাত্রি—ওপরে তারাখচিত আকাশ। অস্বচ্ছ আলোয় পিঙ্গল, অন্ধকার রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর ওপরে যেন প্রেতচ্ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। একচক্ষু মোটরগুলোর স্রোতে ভাঁটা পড়ে গেছে একেবারে। এক আধখানা মোটর যা চলছে, তাদের শব্দ যেন বড় বেশি জোর—যেন সে শব্দে দুপাশের বাড়িগুলো অবধি কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে দু একজন পথচারী চলেছে, তাদের জুতোর শব্দ যেন পাঁচগুণ হয়ে বহুদূর থেকে ভেসে এসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু কোথায় এত রাত্রেও কারা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে—হাল্কা একটা হিন্দী গান, সুরটা খ্যামটার মতো। প্রতিমুহূর্তে যারা আসন্ন দুর্বিপাকের প্রহর গুণছে, তারা যেন ওই গানের ভেতর দিয়ে নশ্বর-জীবনের শেষ আনন্দটুকু উপভোগ করে নিতে চায়।

—সুমিতাদি?

সুমিতা চমকে উঠল: কে?

মিষ্টি হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল: ভয় পেলে নাকি? আমি রমলা।

—ওঃ। কিন্তু এত রাত্রে হঠাৎ উঠে এলি যে?

—এমনি, ঘুম আসছিল না। আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখছিলাম তুমি কখন থেকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছো। তাই এলাম।

—বেশ, আয়।

রমলা এসে পাশে দাঁড়ালো। ওপাশের একটা ঘর থেকে যে আলো এসে পড়েছিল, তাতে করে রমলাকে সুমিতা দেখে নিলে একবার।

শ্যামবর্ণা একটি ক্ষীণকায়া মেয়ে, দেখলে কেউ সুন্দরী বলতে রাজী হবে না। কিন্তু রূপ না থাকলেও লাবণ্য আছে; চোখ মুগ্ধ হয়ে ওঠে; ছোট বোনের মতো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, আদর করতে ইচ্ছে করে।

সুমিতা আস্তে রমলার পিঠে হাত রাখল। রমলা আরো ঘন হয়ে তার কাছে এগিয়ে এল, যেন আশ্রয় খুঁজছে।

—কী হল রমলা? কিছু বলবি?

রমলা কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে বাইরের তরঙ্গিত রাত্রির ভেতরে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, আদিত্যদার কোনো খবর কি আসেনি সুমিতাদি?

—না তো।

—আর অনিমেষদার?

বুকের ভেতরে একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুমিতা বললে, নাঃ।

—ওখানে কী সব গণ্ডগোল হয়েছে, তুমি জানো?

সুমিতা মনের ভেতরে ক্লান্তি বোধ করতে লাগল। এ আলোচনা তার ভালো লাগছে না, এ প্রসঙ্গটাকে সে এড়াতে চায়। শ্রান্ত গলায় জবাব দিলে, নাঃ, কিছুই না।

রমলা চুপ করে রইল। এ কৌতূহলগুলো স্বাভাবিক হলেও এগুলো তার বলবার কথা নয়। রাত বারোটার পরে যে প্রসঙ্গ ও যে চিন্তা তার স্নায়ুকে এমন ভাবে সজাগ করে রেখেছে, তারা সম্পূর্ণ আলাদা। আদিত্য আর অনিমেষের কথাটা তারই ভূমিকা মাত্র।

রাস্তার ওপরে জোরালো টর্চের আলো পড়ল। মচ্ মচ্ করে জুতোর শব্দ। দুজন সার্জেন্ট রাউণ্ডে বেরিয়েছে। শান্তি রক্ষা করছে যুদ্ধ-বিস্মিত নিশীথ নগরীর। গ্রামোফোনে হিন্দী থ্যামটার গানটা বারে বারে বাজছে, বাজছে ঘুরে ঘুরে। বোধ হয় মদের বোতল খুলে নিয়ে বসেছে একদল।

রমলা আস্তে আস্তে, অত্যন্ত কোমল গলায় বললে, আজকে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে সুমিতাদি।

—কী ব্যাপার?

রমলার স্বর আরো মৃদু হয়ে এল: আজকে দেখা হয়েছিল।

—তাই নাকি? বাসুদেবের সঙ্গে?

রমলা চুপ করে রইল।

—কী বললে?

—যা বলে আসছে চিরকাল।

—অর্থাৎ ফিরে এসো? তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছি? জীবনে শুধু রাজনীতি নয়, তার অন্য দিকও আছে। এই তো?

—শুধু এই? আরো অনেক কথা। তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই নেই। এত করেও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না সুমিতাদি। ঢের লেখাপড়া শিখেছে, তবু এই সহজ জিনিসটা কেন যে বুঝতে পারে না—আশ্চর্য!

সুমিতা সস্নেহে হাসল: সবাই কি সব জিনিস বুঝতে পারেরে বোকা? পৃথিবীতে একদল নির্বোধ থাকবেই—হাজার চেষ্টা করলেও তোরা কখনো তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াতে পারবি না।

রমলা যেন আহত হল একটুখানি: তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ না তো?

সুমিতা রমলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল: ঠাট্টা করব কেনরে? যা সত্যি তাই বলছি। বাসুদেব চৌধুরী কখনো আদিত্য রায় হতে পারবে না, ওরা আলাদা ধাতের মানুষ।

রমলা বললে, আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি সুমিতাদি। যেখানে যাই কেমন করে খোঁজ নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়। আর এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে কী বলব।

—এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে ভয়ানক রাগ হয়, তাই না?

রমলা মাথা নিচু করে জবাব দিলে হুঁ। কিন্তু তার আকার-ইঙ্গিতে এটা অন্তত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বাসুদেব নিতান্ত অশোভন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও যে অনুভূতিটা তার মনে জাগে, সেটা আর যাই হোক, রাগ যে নয়, এটা নিশ্চিত।

—তাহলে এখন কী করবি?

—কী করব তাই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। আজকে একটা ভারী বিশ্রী কথা বলেছে, সেই থেকে খারাপ হয়ে আছে মনটা।

—কী বিশ্রী কথা বলেছে?—সুমিতার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর কৌতূহলী হয়ে রমলার লজ্জিত মুখের ওপরে পড়ল।

—বলেছে—রমলার গলাটা একবার কেঁপে উঠল: বলেছে আমি যদি কথা না শুনি, তা হলে আত্মহত্যা করবে এবারে।

—আত্মহত্যা!

রমলার সুরে যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার আভাস পাওয়া গেল: হুঁ।

—পাগল নাকি রে? একটা বুদ্ধিমান মানুষ আত্মহত্যা করবে কী রকম? ও তোকে ভয় দেখিয়েছে।

রমলা প্রতিবাদ করলে: না সুমিতাদি ভয় দেখানো নয়। যেরকম মানুষ, সব করতে পারে। সব সময় খেয়ালের ওপরে থাকে, কখন যে কী করে বসবে—

হঠাৎ কেমন একটা বিদ্বেষে সুমিতার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। রমলা দুঃখ করছে, বাসুদেব যে তাকে জ্বালাতন করে বেড়ায় সেজন্যে ক্ষোভ করছে, আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়েছে বলে তার অস্বস্তির সীমা নেই; কিন্তু সব কিছুর ভেতর দিয়ে একটা সুর স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, সেটা সুখের, সেটা গর্বের। সাধারণ একটি কালো মেয়ে, তবু একজন তাকে এত বেশি ভালোবাসে

যে তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে চায়, এটা তার কাছে যেমন গৌরব, তেমনি আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠেছে!

ক্ষণিকের জন্যে সুমিতার মনটা যেন কালো হয়ে গেল। বাসুদেব রমলাকে চায়, প্রাণ দিয়ে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অথচ রূপ নেই রমলার, এমন কিছু বিশেষত্বও নেই। আর সে? তার তো সব ছিল, তবু অনিমেষ তাকে স্বীকার করে নিলে না, বৃহত্তরের আহ্বানে অনায়াসে পেছনে ফেলে চলে গেল। বাসুদেবের মতো গম্ভময় ইতিহাসের অধ্যাপক যেখানে বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে নিজের হাতে নিজের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে চায়, সেখানে কবি রোম্যান্টিক অনিমেষ এমন ভাবে নিজেকে বজ্রকঠিন করে তুলল কী উপায়ে? এমন একটা বজ্রমণির ছোঁয়াই কি সে পেয়েছিল?

সুমিতা হঠাৎ রূঢ়ভাবে বলে ফেলল, তোরও দোষ আছে। প্রশ্রয় দিস বলেই ওসব নাকে কাঁদবার সুযোগ পায়। পুরুষকে এখনো চিনিসনি কিনা। মিষ্টি কথা ভালো করে সাজিয়ে বলতে ওরা ওস্তাদ, কথার প্যাঁচে লোককে ভুলিয়ে দেওয়াতেই ওদের বাহাদুরী।

সুমিতার স্বরের রূঢ়তায় রমলা চমকে গেল। ঠিক এমনটা সে আশা করেনি, সুমিতাদির পক্ষে এটা কেমন অশোভন আর অস্বাভাবিক বলে তার ঠেকছে। সে কথা বলতে পারল না, শুধু মূক-বিস্ময়ে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমিতা যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেছে। একটানা বলে চলল, কথা বলা একটা আর্ট, সে আর্ট ওরা ভালো করেই জানে। কিন্তু ওদের পক্ষে সেটা শুধুমাত্র আর্ট ফর আর্টস্ সেক—জীবনে তার প্রয়োগ নেই। ওরা মুখে যা বলে, তার এতটুকুও যদি অনুভব করত, তাহলে পৃথিবীর চেহারাটা এতদিনে আগা-গোড়াই বদলে যেত, বুঝলি?

রমলা শুনে যেতে লাগল, জবাব দেবার মতো কোনো কথাই সে আর এখন খুঁজে পাচ্ছে না।

—কী, কথা বলছিস না যে?

—কী বলব?

—কী বলবি?—যেন অন্ধ একটা রাগে হঠাৎ ফেটে পড়ল সুমিতা: সোজা বাড়ি ফিরে যা—বাসুদেবকে বিয়ে করে বেশ একটা গিন্নীবান্নী হয়ে বোস। দিন কাটবে ভালো, প্রজাপতির অনুগ্রহে বংশবৃদ্ধি করতে পারবি, তাতে বাধা পড়বে না।

—সুমিতাদি!

এতক্ষণে সুমিতার চমক ভাঙল। এ সে করছে কী! এ কার কথা কাকে সে বলছে! রাত্রির এই পরম বিস্ময়কর বিচিত্র মুহূর্তটিতে নিজের মনের একান্ত নিভৃত দুর্বলতাটাকে এই ভাবে সে প্রকাশ করে বসল শেষ পর্যন্ত! যে আঘাত নিজেকে দিতে চেয়েছিল, স্বগতোক্তিটা শেষে সজোর হয়ে সেই আঘাতটা গিয়ে পড়ল বেচারী রমলার ওপরে! রমলার কী দোষ? কালো মেয়ে সে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অতি সাধারণ মেয়ে—একজন পুরুষের প্রেম যদি তার সেই অতি সাধারণ জীবনটিকে মধুর উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ করে দিয়ে থাকে, তাতে সুমিতার এতটা হিংসা করবার কী আছে। নিজেকে নিজেই সে এমন করে ছোট করে ফেলল অবশেষে!

সুমিতার হাতখানা আবার রমলার পিঠের ওপরে ফিরে এল।

—না সুমিতাদি—রুদ্ধ গলায় রমলা বললে, আমি ফিরে যাব না। আত্ম-হত্যা করে করুক, কিন্তু সে নিয়ে ভাবলে তো আমার চলবে না। ওর চাইতে ঢের বড় কাজ আমার আছে।

সুমিতা বললে, থাক থাক। কিছু মনে করিসনি ভাই। তোকে একটু ঠাট্টা করলাম খালি। বাসুদেবের কথা না হয় ভাবা যাবে কাল সকালে, এখন ব্যস্ত হবার দরকার নেই তা নিয়ে। তুই গিয়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বিছানায় শুয়ে পড়, ঢের রাত হয়ে গেছে।

রমলা আর দাঁড়ালো না। মনের মধ্যে তীব্র ঘা লেগেছে একটা। সুমিতাকেও সে আর সহ্য করতে পারছে না। যেখানে আশ্রয় আশা করেছিল, সেখানে দেখেছে দাবাগ্নি। সুমিতাদির বুকের ভেতরে এমন একটা আগ্নেয়গিরি যে লুকিয়ে রয়েছে, একথা কি সে কোনো দিন স্বপ্নের মধ্যেও ভাবতে পেরেছিল!

রমলা চলে গেল। বারান্দায় সুমিতা আবার একা। কলকাতা গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে এখন। সাড়া নেই, শব্দ নেই, গ্রামোফোনটাও থেমে গেছে। শুধু আকাশে নক্ষত্রমালার আবর্তন চলেছে নিয়মানুগ গতিতে—পৃথিবীর ওপর এত অসংলগ্নতা, এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ওদের কোনো নিয়মভঙ্গ ঘটবেনা কোনো দিন।

চব্বিশটা ঘরের আলো নিবেছে। সবাই ঘুমিয়েছে, হয়তো রমলাও ঘুমিয়ে পড়বে একটু পরে। কিন্তু সুমিতার আজ আজ আর ঘুম আসবে না। হংস-মিথুন নীড়ের ঠিকানা হারিয়েছে, ঠিকই লিখেছে ইন্দু। এবার অসীম সাগরের ওপর দিয়ে অশ্রান্ত যাত্রা দিগন্তের দিকে—সেই দিগন্ত, যা কামানের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, রাঙা হয়ে গেছে বোমার আগুনে।

ছয়

শালের বন, ছোট লাইন, ছোট ট্রেন। মন্থরগতিতে চলতে চলতে খেলনার মতো রেলগাড়িটা এসে জঙ্গলের মধ্যে থামল। স্টেশন নয়, স্টেশনের পরিহাস। একদিকে ঘন জঙ্গল অচ্ছেদ্য রেখায় তরাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে, অন্যদিকে চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ সবুজ-সমুদ্র। সমান মাপে ছাঁটাইকরা কোমর সমান উঁচু গাছের শ্রেণী ওদিকের দিগন্তরেখায় মিশে গেছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শিরিষ গাছ ছায়া দিচ্ছে তাদের। আর সামনে কাঠের খুঁটি দেওয়া একখানা চালাঘর, তার গায়ে লেখা বাতাসীপুর স্টেশন।

অদিত্য নেমে দাঁড়ালো পাথর ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে। শুধু পাথর নয়, প্রচুর বালিও মিশে আছে। এককালে এখান দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝোরা বয়ে যেত বোধ হয়। কিন্তু সে ঝোরা আজ ফল্গুধারা হয়ে মাটির তলায় মিলিয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে অংসলগ্ন বালুবিস্তৃতি।

বালি আর পাথরের মধ্যে দিয়ে অনিশ্চিতভাবে হাঁটতে লাগল আদিত্য। কোথায় কোন্‌দিকে যাবে ঠিক জানা নেই। এই পর্যন্ত জানে, এখানে নেমে মাইল তিনেক হাঁটলে বাগান পাওয়া যাবে—যে বাগানে আজ অনিমেষ বিপন্ন আর বিব্রত হয়ে আছে।

একটা চুরুট ধরিয়ে আদিত্য চিন্তা করতে লাগল।

বাঙালি স্টেশন মাস্টার কিছুক্ষণ থেকে আদিত্যকে লক্ষ্য করছিলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

—আপনার টিকেটটা দিয়েছেন স্যার?

—না—এই নিন।

টিকেটখানা হাতে নিয়ে তার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন স্টেশন মাস্টার।—ওঃ, কলকাতা থেকে আসছেন। তা কোথায় যাবেন আপনি?

—রংঝোরা বাগান। কোন্‌দিক দিয়ে যাব বলতে পারেন?

—রংঝোরা? এদিক দিয়ে নেমে এগিয়ে যান। ভালো পীচের রাস্তা আছে, মাইল তিনেক হাঁটলেই বাগান পাবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

আদিত্য চলতে স্থরু করলে।

মনের ভেতর বিশৃঙ্খল চিন্তা ঘুরছে। বাগান যে কী ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণাই তার নেই। অনিমেষ সেখানে কী ভাবে আছে, কেমন আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তা ছাড়া বাগান সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী সে শুনেছে, তাতে মনটা আরো বেশি সংশয়ে পীড়িত হয়ে আছে। বিচিত্র দেশ—বিচিত্রতর পরিবেশ। জঙ্গলের মধ্যে অষ্টাদশ শতকীয় রাজ্যপাট। চা বাগানের সাহেব বিধাতার মতো দণ্ডধর। নির্মম আর সংক্ষিপ্ত বিচার—কালাজ্বরে স্ফীতোদর কুলির পিলে-ফাটানো সেখানে এমন কিছু চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়। তার খবর বিশ্বদূত রয়টারের মুখে এসে পৌঁছোয় না—প্লাই-উডের বাক্সে তার রোমাঞ্চকর বার্তা নিউজ এডিটরকে অনুপ্রাণিত করে না। শালবনের নিভৃত পত্রাচ্ছাদনের রহস্যময় অন্তর্লোকে রহস্যজনকভাবেই তা মিলিয়ে যায়—যেমন করে জঙ্গলের পথে অত্যন্ত অনায়াসে ভালুক এসে বজ্র-আলিঙ্গনে একটা মানুষের হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিয়ে যায় কিংবা নীল-গাইয়ের শিং বুকের পাঁজরা ভেঙে ফুসফুসটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলে।

বাগান তো ফরবিডেন প্যারাডাইজ—ঢোকবার কোনো উপায় নেই। আশ্রয় কুলিলাইন, কিন্তু সেও নিরাপদ নয়। সাহেবের শ্যেন দৃষ্টিকে তা এড়াতে পারবে না। কোথায় অনিমেষ—কী ভাবে আছে কে জানে।

চলতে চলতে হঠাৎ আদিত্যের চোখ পড়ল সামনের দিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা।

তুষারপুঞ্জিত শুভ্র বপুতে হীরার মতো সূর্যকিরণ। পূর্ব দিগন্তে সূর্য-সারথি দেখা দিলে ওখানে তার প্রথম সম্বর্ধনা। আদিত্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

পীচের পথ চলেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে গড়ে দেওয়া পথ—মসৃণ, মনোরম। চমৎকার বীথিপথ। আল্‌গা-হয়ে-যাওয়া বনের আড়ালে আড়ালে সূর্য আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। আশ্চর্য জগৎ। শাল গাছের মাথায় হরিয়াল ডাকছে—বন-মুরগী চলেছে ছুটে।

কেমন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ যেন আদিত্যকে আচ্ছন্ন করে দিলে। মনে পড়ল কলকাতা। দিগন্তে যুদ্ধ আর ভীতিজর্জর রাজপথে মানুষের ক্লেদাক্ত শোভাযাত্রা। কবি ইন্দুর কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে :

প্রাচীতে প্রারব্ধ হোলো যুগান্তের মহা নরমেধ
নিষ্প্রদীপ নিশীথ নগরী।
বিদেহী-বেতারে বাজে প্রলয়ের সমুদ্র-গর্জন
ভয়ার্ত মানুষ পশু চলিয়াছে ক্লেদাক্ত মিছিলে
শোভাহীন উগ্রতায়, প্রাসাদের পরিসীমা পারে,
আঁকড়ি' রাখিতে হবে দুর্মূল্য জীবন।

দুমূল্য জীবনকে আঁকড়ে রাখতে হবে। নাগরিক জীবন। সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, বিস্বাদ, যক্ষ্মার রোগীর মতো বিড়ম্বিত, মনুষ্যত্বের বিচারে প্রতি-মুহূর্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এদিকে শ্যামবাজার, ওদিকে টালীগঞ্জ—মাঝখানে ডালহাউসি স্কোয়ার। যমুনা আর সরস্বতী এসে মিশেছে গঙ্গায়। বাঙালি জীবনের ত্রিবেণীসঙ্গম।

অথচ কোথাও নেই পরাজয়ের গ্লানি, কোথাও নেই একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর অপমানবোধ। প্রতি মুহূর্তে দুলছে অনিশ্চয়ের সূক্ষ্ম সূত্রে, চাকরি আর বেকারী—দুরাশা আর আত্মহত্যা চলেছে পাশাপাশি হাত ধরে। ভাগ্য

মানেনা, কিন্তু কোথাও তো কোনো প্রতিবাদ নেই। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝে তাকে কেন বরণ করে নিতে পারে না জীবনের দীক্ষা দিয়ে? কেন বুঝতে পারেনা, আজ যখন নিচের মানুষ মাথা তুলছে তখন তারও তো এসেছে বাঁচবার ইঙ্গিত। শূন্য সাধনায় নয়, নিচের শক্ত মাটির ওপর জোর দিতে পারলেই সে বেঁচে যাবে?

সে যাই হোক, আপাতত তার দরকার দলের ইউনিটগুলোর খোঁজ করা। কিন্তু এ একটা এমন প্রশ্ন যে কাউকে জিজ্ঞাসাও করা যায় না। তাছাড়া এদিকে এখনো কোনো ভালো ইউনিটও গড়ে ওঠেনি, সবই আছে ভ্রূণ অবস্থায়। এক্ষেত্রে যদি লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে থাকে, তা হলে ভুলই করেছে অনিমেষ। কারণ, বাইরে থেকে উপযুক্ত সমর্থন সহায়তা না থাকলে আন্দোলন অর্থহীন, সহজেই তা ভেঙে পড়বে।

সে ভুল যদি হয়ে থাকে, তা হলে তার প্রতীকার নির্ণয় শক্ত। বিচ্ছিন্ন বীরত্বে বিপ্লব হয় না, একথা বার বার বলেও বোঝানো গেলনা। ক্ষেপে যায় ছেলেরা, মাথা গরম করে বসে। কী করবে জানেনা আদিত্য। খানিকটা যান্ত্রিক ভাবেই হেঁটে চলল সে। চলল ছায়াপথ দিয়ে।

কিন্তু যা ভাবছিল এরই আগে। ত্রিবেণী-সঙ্গম? মানবতার মহাতীর্থ? নাকি পশ্চিমগামিনী সুবর্ণরেখায় উপনদীর আত্মদান—তিলে তিলে, রক্ত দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, মানবতা দিয়ে?

আর—এখানে অরণ্য। আদিম অরণ্য, প্রাথমিক অরণ্য। পৃথিবীর প্রথম প্রাণশক্তির শ্যামায়িত বিকাশ। কোথায় ছুটেছ তোমরা, পালাচ্ছ কোথায়? শহরে, গ্রামে? তার চাইতে চলে এসো এখানে, সব ভুলে যাও, ভুলে যাও সেদিনের কথা—যেদিন এই বনানীর আশ্রয় থেকে তোমরা বেরিয়ে চলে এসেছিলে, তোমরা ভেসে পড়েছিলে সভ্যতার স্রোত প্রবাহে, এগিয়ে গিয়েছিলে বিজ্ঞানীদের জ্যামিতিক পরিমিতি-কষা রাজপথ দিয়ে। তার ফলে

এল দ্বন্দ্ব, এল সমস্যা। অনেক পেলে, হারালেও অনেক। খনির তলা থেকে জাগিয়ে তুললে ঘুমন্ত দানবকে, তার হাতে তুলে দিলে বিশ্বকর্মার হাতুড়ি। সব কিছুকে ভেঙে চুরে সে গড়ে দিলে যন্ত্র—যান্ত্রিকতা, আকাশছোঁয়া বাড়ি, বৈদ্যুতিক স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দানবের রক্তে জেগে উঠেছে পাশব বিদ্রোহ। হাতুড়ি ফেলে দিয়ে গদা তুলে নিয়েছে হাতে, ভেঙে চুরমার করছে সমস্ত, কিছু বাকী রাখবে না কোনোখানে।

তার চেয়ে পালাও, পালাও, পালিয়ে এসো এখানে। এই জঙ্গলে, এই শালবনানীর নিভৃত মর্মলোকে। দৈত্যের গদা এখানে তোমাদের খুঁজে পাবে না। আবার পশুর মাংস, আবার চকমকির আগুন—আবার পাথরের অস্ত্র। শহরে পড়ে থাক শীলারা, পড়ে থাক হেমন্তবাবুরা—বক রাক্ষসের মুখে খাদ্য জুগিয়ে দিক নিরীহ নির্বোধ প্রজাবৃন্দ। তোমরা চলে এসো, আদিমতায় ফিরে যাও—সার্থক হোক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্বপ্ন থেকে ডি, এইচ, লরেন্সের কামনা; জ্যামিতির রেখা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক, বিদ্যুতের তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাক পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে—

কিন্তু!

কিন্তু এ কী ভাবছে আদিত্য! একি ওর মনের কথা, না কাল রাত্রে ট্রেনের সেই দুর্বিষহ প্রহরগুলোর প্রতিক্রিয়া এটা? সেই রাজনীতির তর্ক, সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা মেয়েটি—শশাঙ্কের সেই স্বার্থপর পলাতক মুখচ্ছবি। কিন্তু একি সত্য? এতদিন ধরে রাজনীতি চর্চা আর ফিজিক্‌সে এম এস-সি পাশ করবার এই কি পরিণতি?

না—না, কখনো না। মানুষ কখনো পিছোয় না, পিছোনো তার ধর্ম নয়। মানুষ কখনো আর হামাগুড়ি দিয়ে তার শৈশবে ফিরবে না, মাতৃগর্ভে তার প্রত্যাবর্তন হতে পারে না কোনোদিন; যে দানব আজ বিদ্রোহী, তার বিদ্রোহকে দমন করতে, দলন করতে কতক্ষণ লাগবে! অমিত মানুষের শক্তি,

অপরিসীম তার আত্মবিশ্বাস। আবার বাঁধা পড়বে কালযবন, পশু চূর্ণ হয়ে যাবে—বজ্রধর মানুষের শক্তি নতুন নির্দেশ দেবে তাকে। আজ যে হিংসা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে তো এই আদিম-সত্তারই দান,—তাকে নিমন্ত্রণ করাই মানুষের সভ্যতা, মানুষের প্রগতির তাৎপর্য।

ঘুমিয়ে থাক্ শালবন—শান্ত পরিতৃপ্তি নিয়ে, নির্জনতায় অখণ্ড আনন্দে বিস্তীর্ণ হয়ে থাক তার নীলচ্ছায়া। এখানে আর আমরা ফিরে আসব না। জ্যামিতির রেখা আমরা টেনে আনব এখানে, বয়ে আনব বিদ্যুতের শক্তি, তোমরা আজ যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছ, তোমরা আবার ফিরে আসবে, ফিরে আসবে কলকাতায়—কলকাতাকে সঞ্চারিত করবে দিকে দিকে, অরণ্যে প্রান্তরে। পলাতকের মিছিল সেদিন রূপায়িত হবে বিজয়ীর অভিযানে। তাই ইন্দু লিখেছে :

প্রশান্ত সমুদ্রজলে ফেনায়িত নিষ্ঠুর সংগ্রাম :
দিগন্তের চক্রতীর্থে রক্তশতদল
দেবতার সিংহাসন ভাবীযুগে করিবে রচনা।—কিন্তু এখনো সময় হয়নি :
মালয়ের তীরে তীরে পীতরক্তে নামিল জোয়ার
সিদ্ধার্থের স্বপ্ন বয়ে তন্দ্রাতুর পাষাণ দেবতা—

আদিত্য চলেছে এগিয়ে। চুরুটের ধোঁয়া ভেসে যাচ্ছে শালবনের বাতাসে বাতাসে। মনে পড়ছে অনিমেষও কবিতা লিখত এক সময়ে, কবি অনিমেষ। আজ চা-বাগানের অক্লান্তকর্মী যে কিভাবে আছে সেটা অনুমানও করতে পারছে না আদিত্য। যে ভুল করে বসেছে, তার প্রতীকারটাই বা হবে কেমন করে?

দূরে কতকগুলো ঘরবাড়ি—একটা বাগানের শ্যামায়িত ব্যাপ্তি। ওই কি রংঝোরা বাগান? আদিত্য পা চালিয়ে দিল।

সাত

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তেমনি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রবার্টস। শিরা-স্নায়ুতে নর্ডিক নীলরক্ত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে বারে বারে। কপিশ চোখে বন্যহিংসা জ্বলছে—বন আর বাঘ-ভালুকের সংস্পর্শে থেকে রবার্টস তাদের স্বভাবেরও খানিকটা আয়ত্ত করে নিয়েছে নিজের মধ্যে।

হাতের সামনে জাপানীরা নেই, যারা মালয় কেড়ে নিয়েছে, যারা ডুবিয়ে দিয়েছে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌, সমুদ্র-শাসক ব্রিটানিয়াকে যারা সমুদ্রের তলায় চালান করে দেবার মতলব করেছে, তাদের কাউকে হাতের সামনে পাচ্ছে না রবার্টস। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রু যে আছে সেও নিতান্ত অবহেলা বা অবজ্ঞার ব্যাপার নয়। এই চরম দুর্বল মুহূর্তে আর চূড়ান্ত দুঃসময়ে সাপের মতো এরা এসে মাথা তুলেছে মাটির তলা থেকে। কিন্তু এই উদ্যত মাথাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে—ব্রিটানিয়া শুধু সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সসাগরা পৃথিবীর মাটিতেও তার তুল্যমূল্য অধিকার, তার সমান মর্যাদা।

মাথার ভেতরে হুইস্কির নেশা। বাঘের মতো দৃষ্টিতে অনিমেষের দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টস। যেন গ্রাস করবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তাকে। শুনেছিল জাপানীরা নাকি দরকার হলে নরমাংস খায়, সেও দেখবে নাকি একবার?

দূরে কুলিরা, ভীত বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না তারা, কথা বলবার শক্তি বা সাহসও পাচ্ছে না কেউ। মাইনে বাড়াবার দাবী তুলেছিল, সে দাবীর জবাব রবার্টস্‌ তৈরী করে রেখেছে তার দুনলা বন্দুকের মুখে। তাদের মধ্যে হঠাৎ এসেছিল অনিমেষ, এসেছিল একটা নতুন-পৃথিবীর

খবর নিয়ে। কোথায় নাকি এমন একটা দেশ আছে যেখানে মালিক বলে কেউ নেই, যেখানে কথায় কথায় বুকে-পিঠে বুটের লাথি এসে পড়ে না। যেখানে খাটুনি কম, মজুরী বেশি। যেখানে ওরা সব, ওদেরই সব।

ম্যানেজার নেই, সুপারভাইজার নেই, বাগানের ছোট বড় লাটসাহেব বাবুরা নেই, বেগার খাটনি নেই। যেখানে কুলির ছেলে বাবুদের চাইতেও বেশি লেখাপড়া শেখে, বাবুদের চাইতেও বেশি রোজগার করে। ব্যানার্জি-বাবু সেই দেশের খবর ওদের দিয়েছিল—আশ্বাস দিয়েছিল সেই দেশের মানুষদের মতো ওরাও সব পাবে, এত বড় পৃথিবীটার যা কিছু আছে সব চলে আসবে ওদেরই হাতের মুঠির ভেতরে।

সব কথা ওরা বোঝেনি, যতটুকু বুঝেছিল তাই ওদের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল একটা বিচিত্র আস্বাদ, একটা বিপুল অনুভূতি। আশায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মন। ব্যানার্জি বাবুকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল : ব্যানার্জিবাবু সব করতে পারে, তাদের গুণিনদেব মতো অসাধ্যসাধন করে ফেলতে পারে। একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে ওরা উঠে দেখবে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় একটা নতুন সূর্যের আলো পড়েছে : ম্যানেজার নেই, বাবুরা নেই। কলটা ওদের—বাড়িঘরগুলো ওদের – সব ওদের, শহরও ওদের। সেইদিনের আসন্ন ইঙ্গিত যেন শুনতে পাচ্ছিল অনিমেষের মধ্যে।

কিন্তু কী হল—এ কী হয়ে গেল।

সমস্ত মন নিরাশার মধ্যে তলিয়ে গেছে। সামনে ব্যানার্জিবাবু পড়ে আছে রক্তাক্ত হয়ে। ওদের জীবনে সম্ভাবনার কথা যা ওবা শুনেছিল তা একটা নিছক রূপকথা। যা আছে তাই সত্য—যা এতকাল চলে আসছে তাই সত্য। কিছুই বদলাবে না; চিরকাল ওদেব বুকের সামনে বন্দুকের নলটা উঁচু হয়েই থাকবে, চিরদিন ওরা ভয় করেই চলবে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপরে সে সূর্য আর কখনো উঠবে না।

রবার্টস আগুন ঝরা গলায় বললে, সব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে?

কুলিরা কাঁপতে লাগল, কথা বলতে পারল না।

—এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও—আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাও। ছুঁড়ে ফেলে দাও জঙ্গলের মধ্যে। গো—

এক পা এক পা করে কুলিরা এগোতে লাগল। রক্ত শুধু অনিমেষের গা থেকেই ঝরেনি, তাদের বুকের ভেতরও যেন ওই আঘাতগুলো এসে পড়েছে।

—আর শোনো। এক একটি বর্ণও যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। যদি কেউ বলে, তার অবস্থাও ঠিক এই রকম হবে—রিমেম্বার।

কুলিরা অনিমেষের দেহকে বহন করে নিয়ে গেল।

সপদদাপে ঘরে ঢুকল রবার্টস। মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কী একটা ঘটে চলেছে। যেন একটা প্রচণ্ড যুদ্ধে গৌরবময় জয়লাভ হয়েছে তার, নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাসের একটা প্রবল উদ্দীপনা। আঃ, কেন সে যোগ দিল না যুদ্ধে? আজ সে যদি সেনাপতি হত, তাহলে মালয়ের যুদ্ধের ইতিহাসটাই হয়তো বদলে যেত, সব কিছু হয়ে যেত সম্পূর্ণ অন্যরকম। রুল ব্রিটানিয়া রুল দ্য ওয়েভ্‌স—

ঘরে ঢুকে আরও দু পেগ হুইস্কি গিলল সে। একটা মাসিকপত্র খুলল, প্রথমেই বেরিয়ে পড়ল অ্যাডল্‌ফ হিটলারের একটা ছবি। দ্য ডেভিল, দ্য মন্‌স্‌টার। দাঁতের ভেতর থেকে বেরুল একটা চাপা রূঢ় গর্জন। পরক্ষণেই পত্রিকাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল রবার্টস।

তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা কিল মারল কলিং বেলটার ওপরে। বেলটা শুধু যে বেজে উঠল তাই নয়, টেবিলটা শুদ্ধ কেঁপে উঠল থর থর শব্দে। ওটা কাঠের টেবিল না হয়ে যদি তোজোর মাথা হত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়ো হয়ে যেত বোধ হয়।

কম্পিত পায়ে সাঁওতাল কুলি ঢুকল একটা।

—ডাক্তার কো বোলাও—

—জী—

কুলিটা পালিয়ে বাঁচল। হাতের পাশেই রবার্টসের দো-নলা বন্দুকটা দাঁড়ো করানো। মগজের ভেতরে হুইস্কির আগুন নেচে বেড়াচ্ছে। বন্দুকের একটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার দিকে ছিটকে আসাটা আজকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে।

খবর পেয়েই যাদব ডাক্তার এল। ঘটনাটা নিজের চোখেই দেখেছে সে সমস্ত। শ্রাদ্ধ এ পর্যন্ত গড়াবে কল্পনাও সে করতে পারেনি। তাই নিজের মনের ভেতরে এক ধরনের অনুতাপ তাকে পীড়ন করছিল। কিন্তু এ সময়ে তাকে আবার খবর কেন? আশঙ্কা হচ্ছিল।

বলির পশুর মতো যাদব ডাক্তার এসে সেলাম দিল।

—সিট্ ডাউন ডাক্তার।

ডাক্তার তবু দাঁড়িয়ে রইল। অপাঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল রবার্টসের হাতের পাশেই রাখা টোটাভরা বন্দুকটার দিকে।

—ইয়েস স্যার —

রবার্টস বিকটভাবে ধমকে উঠল: নো—নো ইয়েস স্যার। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো।

—ই—ইয়েস স্যার— জড়িত গলায় অস্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে পুঁটলির মতো যাদব ডাক্তার ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

রবার্টস তখন গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। মদের পর মদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আজ তার মনের সব কিছু সীমাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। রক্তের মধ্যে তার যেন যুদ্ধের বিউগল বাজছে। যাদব ডাক্তার আড়ষ্ট দৃষ্টিতে রবার্টসকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—খাবে একটু ?

—নো স্যার—এক্সকিউজ মি—

—হো—হোয়াই ? রবার্টসের দুই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল : তুমিও কি ওদের সঙ্গে ভিড়েছ নাকি ? আমাকে দিয়েছ বাদ দিয়ে ? হো—হোয়াইট্‌স ইয়োর বিগ আইডিয়া ?

—নাথিং স্যার—

—দে-দেন হো-হোয়াই ? কেন খাবে না ?

—মানে, আ-আমি ওসব বেশি স্ট্যাণ্ড্ করতে পারি না স্যার—

—রা-রা-রাস্কেল !

ফট্ করে একটা সোডার বোতল খুলল রবার্টস। হুইস্কি ঢালল গেলাসে। সমস্ত শরীরটা তার টলছে, তবু আজ মদে বিরাম দেবে না সে। রক্তে রক্তে বিউগ্‌ল বাজছে, স্নায়ুর ভেতরে সে শুনতে পাচ্ছে যেন টর্পেডোর বিস্ফোরণে ফেনায়িত প্রশান্ত সাগরের উত্তাল গর্জন।

—ডাক্তার—

—ইয়েস স্যার ?

—কী ভেবেছ ? স্বাধীন হয়ে গেছ তোমরা ?

—না স্যার, কক্ষণো না।

—ভেবেছ, যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, তাই না ? এইবার তোমরা আমাদের বুকের ওপরে চেপে বসবে ?

—নেভার স্যার।—যাদব ডাক্তার নেশা করেনি, তবুও তার গলা জড়িয়ে আসছে : আমি কখনো একথা বিশ্বাস করি না। ওয়ারফাণ্ডে আমি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছি।

—রিয়্যালি ? বেশ, বেশ, ? আই ওয়াণ্ট এ ডগ লাইক ইউ। আর ইউ নট এ ডগ ডাক্তার ?

—ডগ স্যার?—যাদব ডাক্তার মাথার মসৃণ টাকটাকে চুলকে নিলে এইবারে: ই-ইয়েস স্যার, এ ভেরি লয়্যাল ডগ।

রবার্টস টলছে, চোখের রাঙা দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে ক্রমশ। অস্বাভাবিক গলায় বলে চলল, দ্য জার্মানস আর ডগস, দ্য জাপস আর ডগস, দ্য ইণ্ডিয়ানস আর ডগস। ইউ আর এ ডগ ডাক্তার।

—সার্টেনলি স্যার।

—ডাক্তার, কুকুর কি কখনো স্বাধীনতা দাবী করতে পারে?

—কখনো না স্যার।

—কুকুর সব সময় লাথি খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকে নিশ্চয়?

—অফ্ কোর্স স্যার।

ঘোলা চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রবার্টস। মদের নেশায় সমস্ত চিন্তা আর বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। একটা অপরিসীম ঘৃণা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে অনুভূতির অন্ত প্রত্যন্তে। জার্মানদের ওপরে ঘৃণা, জাপানীদের ওপরে ঘৃণা, ইণ্ডিয়ানদের ওপরে ঘৃণা। দুদিন আর দুঃসময় এসেছে বলেই আজ মাটির তলা থেকে কেঁচোরা অবধি উঠেছে কেউটে হয়ে। ব্যানার্জিবাবু! ছদ্মবেশে চু.ক তারই রাজ্যপাটে ভাঙন ধরাবার উপক্রম করেছিল। দ্য ডগ! আর তারই সামনে বসে আছে যাদব ডাক্তার। তাদেরই একজন, তাদেরই মতো কালো চামড়া। হোক লয়্যাল, তবু এ ডগ ইজ এ ডগ আফটার অল।

—ইউ থিঙ্ক সো?

—ই-ইয়েস স্যার—তেমনি শঙ্কিত গলায় যাদব ডাক্তার জবাব দিলে।

—দেন—

বিদ্যুৎগতিতে রবার্টস উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্রচণ্ড বেগে একটা লাথি ঝেড়ে দিলে যাদব ডাক্তারের বুকের ওপরে। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা

আর্তনাদ বেরুল কি বেরুল না, পর মুহূর্তেই চেয়ারশুদ্ধ যাদব ডাক্তার হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মেজেতে।

প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম পুরস্কার।

মিনিটখানেক যাদব ডাক্তার হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল মেজেতে। বিনা মেঘে বাজ নেমেছে আকাশ থেকে। ব্যাথার চাইতেও বেশি জেগেছে বিস্ময়—কী অপরাধে এই শাস্তি ?

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। তার চোখের সামনে রবার্টসের চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা করলে ওই রকম আরো দু একটা লাথির পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তড়িৎগতিতে সে উঠে পড়ল, তারপর মুক্তকচ্ছ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল বাইরে। কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে প্রভুভক্ত কুকুরের অকৃত্রিম পুরস্কার। একটুর জন্যে মাতালের লাথিতে তার দুর্মূল্য মহাপ্রাণীটা বেরিয়ে যায়নি। রবার্টস্ হো হো করে হেসে উঠল। যাদব ডাক্তারের পলায়নটা ভারি উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে তার।

অ্যানাদার ভিক্টরী। আজকে মালয় ফ্রন্টে থাকলে নির্ঘাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত রবার্টস্।

কুলিরা অনিমেষকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল—নিয়ে এল ফ্যাক্টরীর সীমানার বাইরে। যারা এতক্ষণ রবার্টসের বাংলোর সামনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও সন্ত্রস্তভাবে পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে লাগল।

রবার্টস বলে দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিতে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কোন গণ্ডগোলই আর থাকবে না তা হলে। সেইখানেই পড়ে থাকবে, শেয়ালে বা অন্য জানোয়ারে খেয়ে শেষ করে দেবে। কোন দায়িত্ব থাকবে না রবার্টসের, কোন অসুবিধাও না। জানোয়ারে যাকে মেরে ফেলেছে, তার সম্বন্ধে রবার্টস আর-কীইবা করতে পারে।

কিন্তু কুলিরা অনিমেষকে জঙ্গলে নিয়ে গেল না।

বনের আড়ালে তখন ঘনিয়ে আসছে দিনান্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োর ওপর দিয়ে রক্তের ধারা যাচ্ছে গড়িয়ে। অনিমেষের সর্বাঙ্গেও রক্ত। ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ছে। নাক দিয়ে কপাল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত নামছে, দিনান্তের আলোয় সে রক্ত জ্বলছে চুনীর মতো। নির্মমভাবেই তাকে মেরেছে রবার্টস।

কুলিরা অনিমেষকে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে। শুইয়ে দিল চা গাছের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তারপর জটলা করতে লাগল কী করা যায়।

কথনোই না। প্রাণ ধরে তারা ব্যানার্জীবাবুকে কখনো জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে না। তাকে বাঁচাবে, তাকে লুকিয়ে রাখবে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন এখনো মুছে যায়নি মন থেকে। রবার্টসের বন্দুকের নল দেখে ভয় পেয়েছিল, সাময়িকভাবে একটা নৈরাশ্য আর অবসাদ এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ওদের চেতনাকে। কিন্তু সেটাই সব নয়—সেটাই শেষ কথা নয়।

ওদের রক্তের মধ্যে ডাক এসেছে। পৃথিবী ওদের, দিন ওদের, আগামী কালের যা কিছু সব ওদের। ভয় পেলে চলবে না। এর শোধ দিতে হবে, এর বদলা নিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। এখানকার চা বাগানের বিষাক্ত বাতাস আর কালাজ্বরের মৃত্যুবীজাণু ওদের নির্জীব করে ফেলেছে বটে, কিন্তু এই ওদের শেষ পরিচয় নয়। এই বাগানে যখন আড়কাঠি ওদের ভুলিয়ে আনে, তার আগে ওদেরও দিন ছিল, ওদের দিগন্তব্যাপ্ত আকাশ ছিল একটা, ওদের পাহাড়ে পাহাড়ে মহুয়ার গন্ধ ভাসত, ওদের দেশে এমনি করে ফুটত শালের ফুল। ওরা সজীব ছিল—ওরা সেদিন কুলি ছিল না, মানুষ ছিল, দিন-মজুরীর বদলে কথায় কথায় ওদের কেউ লাথি মারতে পারত না। সেদিন ওরা তীর শানিয়ে রাখত, টাঙীতে রাখত ধার দিয়ে। আজ ওদের সেই তীর ভোঁতা হয়ে গেছে, মরচে পড়ে গেছে ওদের টাঙীতে।

কিন্তু পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ এসেছে, এসেছে ওদেরও যুদ্ধের দিন। আবার ওরা নতুন করে সেই অস্ত্রগুলো শান দেবে—এর বদলা নেবে।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন কী করা যায়?

কুলি লাইনে নিয়ে রাখবার কোনো উপায় নেই। সাহেবের চোখ শয়তানের চোখ। আর তার চাইতেও বেশি ভয় ওই ডাক্তারটাকে। ওই লোকটাকে ওরা কখনো দুচক্ষে দেখতে পারে না। ব্যানার্জিবাবুর মুখে শুনেছে ওদের অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করার জন্যেই নাকি ডাক্তার এখানে থাকে। কিন্তু ওরা তার পরিচয় পায়নি কোনোদিন। ওষুধ চাইতে গেলে গালাগালি করেছে, কখনো দেখতে এলেও গাল দিয়ে গেছে অশ্রাব্য ভাষায়, যেন অসুখ করাটা ওদের পক্ষে একটা প্রচণ্ড অপরাধ।

ওই ডাক্তারটাই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে দিনরাত। ও ঠিক খবরটা জোগাড় করে সাহেবের কানে পৌঁছে দেবে। তা হলে?

উপায় ঠিক হয়েছে। ধরমবীরের কাঠের গোলায় ব্যানার্জিবাবুর জায়গা হতে পারে। ধরমবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ব্যানার্জিবাবুর, ধরমবীর লোক ভালো, গান্ধী মহারাজের চেলা।

......সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বন থেকে সবে ফিরে এসেছে ধরমবীর, ফিরে ফিরে এসেছে তার কাঠগোলায়। অনেকগুলো গাছে আজ দাগ দিয়ে আসতে হয়েছে, কাল থেকে কাটবার পালা।

শালবনের মাঝখানে ধরমবীরের কাঠগোলা। শুধু শালবন নয়, এখানে ওখানে দু-একটা আম গাছ, লেবু গাছ, পাহাড়ী বাঁশের কয়েকটা ঝাড়ও আছে। আর এই আরণ্যক পরিবেশের ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধরমবীর তার কাঠের গোলা ফেঁদে বসেছে। বড় বড় শালের গুঁড়ি, চেরা কাঠের স্তূপ। সেই কাঠ থেকে বিচিত্র একটা মিষ্টি গন্ধ উঠে চারদিক ভরিয়ে দিয়েছে। ক্লান্ত ধরমবীর নেমে পড়ল টাট্টু থেকে।

নির্জন থমথম করছে চারিদিক। যারা কাজ করছিল তারা চলে গেছে, স্তব্ধতায় ভরে আছে সমস্ত। ধরমবীর টাট্টুটাকে একটা একটা কাঠের খুঁটিতে বেঁধে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওপরে। চাবির তাড়াটা বার করে ঘর খুলল, আলো জ্বাললো, নিজের হাতে স্টোভ জ্বেলে এক কাপ চা খেল, তারপর একটা ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের তাগিদে অর্ডারের আর বিরাম নেই, এক মুহূর্তও বিশ্রাম পাচ্ছে না সে। এই লোকজনে তার কুলোবে না, আরো জোগাড় করতে হবে।

ধরমবীর একবার ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। সব যেন মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। একার সংসার। প্রথম জীবনে একটি মেয়ে তাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছিল, তার ফলে আর বিয়ে কবাটা ঘটে উঠল না তার কপালে। তারপর উনিশ শো তিরিশ সাল এল। গান্ধী মহারাজ ডাক দিলেন স্বরাজের লড়াইয়ের জন্যে। ডাণ্ডীতে সত্যাগ্রহ। আইন ভাঙতে হবে—লড়তে হবে সরকারের বিরুদ্ধে—সত্যাগ্রহীর বুকের শেষ রক্তকণা দিয়ে স্বরাজ আনতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ধরমবীর, জেল খেটে এল। তারপর ঘুরতে লাগল জীবনের চাকা। টাকা দরকার, বাঁচা দবকার। বন ইজারা নিল, শুরু করল কাঠের ব্যবসা। আজ তার অবস্থা ভালো, অনেক টাকার মালিক সে।

প্রেম তাকে দুঃখ দিয়েছে, ব্যথা দিয়েছে বলেই সেটাকে সে ভুলতে পেরেছে; কিন্তু যা পারেনি তা গান্ধী মহারাজের কথা, ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের শপথ।

তাই ধরমবীর আজো পড়াশোনা করে। ভালো হিন্দী জানে, ইংরেজিও জানে একরকম। সেইজন্যেই এই জঙ্গলের মধ্যেও জোগাড় করেছে একগাদা রাজনীতির বই। এতদিন একা ছিল, এইবারে এসে জুটেছে আর একটি আশ্চর্য লোক, তার নাম ব্যানার্জিবাবু। আশ্চর্য মনের মিল ঘটেছে দুজনের

এক সঙ্গে পড়ে, এক সঙ্গে আলোচনা করে। ব্যানার্জিবাবু যে কত জানে ভাবতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ধরমবীর। কিন্তু তাতে সে বশীভূত হয় না, তর্ক চলে, তুমুল তর্ক।

শেষ পর্যন্ত হয়তো চটে ওঠে ধরমবীর। বলে, এ ভায়োলেন্স্।

—ভায়োলেন্স্ না হলে লড়বে কী করে এইসব ভায়োলেণ্ট্‌দের সঙ্গে?

—না, লড়ব না।

—তবে?

—আত্মার শক্তিতে বাধা দেব। সেই আমাদের জোর, সেইখানেই আমাদের জয় হবে।

—কিন্তু কোনো দেশে তা হয়নি।

—নাই হল। কিন্তু আমাদের দেশেও যে হবে না তা কেমন করে জানলে? এ দেশের ধর্ম আলাদা, রীতি আলাদা। আমাদের রাজারা সৈন্য পাঠিয়ে দেশ জয় করেনি, করেছে ধর্মপ্রচারক দিয়ে। মহাত্মাজীর সাধনাও এই।

—কিন্তু সেদিন তো নেই পৃথিবীর।

তর্কের মীমাংসা হয় না। তবু এটা অনুভব করে ধরমবীর যে, তার যেন মনের কবাট খুলে যাচ্ছে। নতুন ভাব, নতুন ভাবনার একটা জগৎ। এই সন্ধ্যাবেলাতেই রোজ ব্যানার্জিবাবু তার কাছে আসে, আজও আসবে নিশ্চয়।

ধরমবীর সিগারেট ধরিয়ে ব্যানার্জীবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় চোখে পড়ল বাগানের একদল কুলি আসছে। কী একটা জিনিষ তারা বয়ে আনছে। আশঙ্কায় শিউরে উঠল ধরমবীর। নিশ্চয় জানোয়ারে মেরেছে কাউকে, কিন্তু কাকে?

দ্রুতপায়ে সে নেমে এল বারান্দা থেকে। বললে, কে?

—আমরা। বাগানের কুলি।

—কী হয়েছে?

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে।

—ব্যানার্জিবাবুকে মেরেছে!—তিন লাফে ধরমবীর নেমে পড়ল নিচে। বললে, কে মারল ?

—সাহেব।

তারপরে খানিকটা উত্তেজিত কোলাহল। তার মাঝখানেই সব কথা শুনতে পেল ধরমবীর, বুঝতে পারল সমস্ত। কিন্তু তখন আর সময় নেই সে সব আলোচনা করবার। ধরাধরি করে অনিমেষকে নিয়ে এল নিজের ঘরে, শুইয়ে দিল বিছানায়। আঘাতের জায়গাগুলো ধুয়ে আইডিন লাগাল, তারপরে মুখে ঢেলে দিল ব্র্যাণ্ডি।

আস্তে আস্তে চোখ মেলল অনিমেষ।

—কেমন আছো ব্যানার্জিবাবু ?

—কে, ধরমবীর ? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। কিন্তু মাথায় বড কষ্ট হচ্ছে।

—সকালেই ডাক্তারকে খবর দেব। বাগানের ডাক্তার তো আর তোমাকে দেখতে আসবে না, আমি ভোরেই সাইকেল দিয়ে লোক পাঠাব মাণিকনগরে।

—আচ্ছা—অনিমেষ চোখ বুজল, তারপরে আবার আস্তে আস্তে চোখ মেলল।

—ভাই, বুকে ভয়ানক লেগেছে। আমার হার্টের অবস্থা আগেই খারাপ ছিল। বোধ হয় বাঁচব না। তুমি শুধু একজনকে একটা খবর পাঠাও।

—কাকে খবর পাঠাব ?

মুহূর্তের জন্যে অনিমেষের মুখের সামনে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। সুমিতা। একদিন আকাশে-বাতাসে যে ফুলের গন্ধের মতো পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, একদিন যাকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ওর সমস্ত প্রাণ, সমস্ত গান, সমস্ত কবিতা। তারপর যখন জীবনের স্রোত বইল অন্যমুখে,

সেদিনও যে ওর পাশ ছাড়েনি, সমস্ত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল, সেই সুমিতা।

কিন্তু না। এখন দুর্বলতার সময় নয়। এখনি সে মরবে না, তার বাঁচবার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ এসেছে, এসেছে স্বাধীন ভারতের মানুষদের সৈনিক ব্রতে দীক্ষিত করবার পরমতম অবকাশ। এখন মরলে চলবে না। আর যদি বা মরে তাতেই বা ক্ষতি কী। সুমিতার কাজে তাতে বাধা ঘটবে না, হয়তো বা মনের দিক থেকে একটা মুক্তিই খুঁজে পাবে সে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে রইল অনিমেষ। বললে, আদিত্যদাকে খবর দাও একটা—আদিত্যদাকে—

—আদিত্যদা! ঠিকানা কী?

কিন্তু ঠিকানা পাওয়া গেল না। অনিমেষ আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলে ধরমবীর। আদিত্যের নাম সে শুনেছে অনিমেষের মুখে, যে খবরের কাগজে আদিত্য চাকরি করে সে কাগজটার নামও জানে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে একটা চিঠি লিখলে কলকাতায় তার এক দেশোয়ালী ভাইয়ের নামে। সে যেন যেমন করে হোক খবরটা ওই পত্রিকার অফিসে অদিত্যবাবুকে পৌঁছে দেয়।

এদিকে কুলিরাও চুপ করে বসে ছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত তারা লাইনে ফিরে গেল না। যতই সময় কাটছে, মনের ভেতরের ভয়টা ততই বেশি করে মুছে যাচ্ছে হালকা কুয়াশার মতো। পাহাড়ী জীবন, মহুয়া ফুলের গন্ধ, শানানো তীর, মাদলের শব্দ। চা-বাগানের বাঁশি, কালাজ্বর আর বাবুদের ভয়ে যা এতকাল চাপা পড়ে ছিল, তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে আবার। অগ্ন্যুদ্গারের নতুন সম্ভাবনায় বুকের তলায় ধূমায়িত হয়ে উঠেছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

তাদের দিন আসছে, তাদের পৃথিবী আসছে। ব্যানার্জি বাবুর কথা মিথ্যে নয়, তাদের স্বপ্নও মিথ্যে নয়। কোনো অন্যায় আর তারা সহ্য করবে না,

এর বিচারের ভার নেবে নিজেদেরই হাতে। এবার দেখিয়ে দেবে তারা শুধু মার খেতেই জানে না, দরকার হলে দিতেও জানে।

ধরমবীরের গোলার বাগানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রইল তারা। ব্যানার্জি বাবু বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—বাঁচবে তো?

—বলা যায় না।

পাথরের মতো বসে রইল তারা। তারপর সেইখানেই নিয়ে এল তাদের ঘরের ভাত পচানো মদ। রবার্টসের মতো ওদেরও শিরায় শিরায় নেশার আগুন জ্বলতে লাগল। যুদ্ধে ওরাও জয়লাভ করবে, ওরাও দমন করবে ওদের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে।

রাত বাড়তে লাগল। ধরমবীরের ঘরে আলো জ্বলছে। প্রহর জেগে অনিমেষের শুশ্রূষা করছে ধরমবীর। শালবনের মধ্যে থম থম করছে রাত। বহুদূরে কোথায় হাতীর ডাক শোনা যাচ্ছে—জঙ্গলের ভেতর থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে বাঘের গর্জন। শালবনের খসখসে পাতাগুলোতে বতাসের অশ্রান্ত দোলা, নানা জাতের পোকার অশ্রান্ত ঐকতান। কুলিরা কতগুলো কাপড়ের মশাল জেলে নিয়ে গোল হয়ে বসেছে ধরমবীরের গোলার সামনে। আগুনের আলোয় ওদের কালো মুখগুলোকে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো অসাড় নিষ্কম্প বলে বোধ হচ্ছে।

ভুল করেছিল রবার্টস।

রক্তবীজের রক্ত পড়েছে মাটিতে। তার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে জেগে উঠছে এক একটি সৈনিক, এক একজন শত্রু। অকালে বিনাশ করতে গিয়ে রবার্টস্ অকালেই জাগিয়ে তুলেছে চামুণ্ডাকে। সাঁওতালের বুকের ভেতরে সাঁওতাল-বিদ্রোহের অতীত ইতিহাস অনুরণিত হয়েছে।

রাত আরো বাড়তে লাগল, একটা একটা করে নিবতে লাগল মশালের আলো। পচাইয়ের হাঁড়ি নিঃশেষিত হয়ে আসতে লাগল। শুধু ব্রোঞ্জের মতো কঠিন মুখগুলো অন্ধকারের ভেতরেও জেগে রইল, জেগে রইল তাদের চোখে আগ্নেয়গিরির আগুন।

পরের দিন।

ভোরের বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল রবার্টসের। নেশাটা কেটে গেছে, চাঙ্গা আর ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। আর তখনি মনে পড়ে গেল অনিমেষের কথা।

কুলি সর্দারকে ডেকে পাঠালো রবার্টস।

—ব্যানার্জি বাবুকে কী করেছিস?

—জঙ্গলে ফেলে দিয়েছি হুজুর।

—জঙ্গলে—কোথায়?

—কালীঝোরার খাদের ভেতর।

যাক, নিশ্চিন্ত। কালীঝোরার গভীর খাদ। মানুষ প্রমাণ জল সেখানে। দুপাশে দুর্ভেদ্য ঝোপ, চারদিকে শালবনের ছিদ্রহীন পত্রাবরণ। আশেপাশে হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই। সুতরাং অনিমেষের জন্য আর ভাবতে হবে না।

—কী বলেছি, মনে আছে তো?

—আছে হুজুর।

—এ কথা যেন বাইরে টের না পায়। সবাইকে বলে দিবি ব্যানার্জি বাবুকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

—জী হুকুম।

কুলি সর্দার চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল রবার্টসের। শুধু ঘুষি নয়, ঘুষও দরকার। ভেতরে ভেতরে অনিমেষ কতটা এগিয়ে গেছে কে

জানে। অথচ আজকে বড় দুর্দিন। খবরের কাগজের পাতায় আর রেডিয়োতে ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসছে। এখান ওখান থেকে আসছে ধর্মঘটের বিবরণ। সুতরাং আরো একটু সতর্ক হওয়া দরকার; কাজ করা দরকার আরো একটু বুদ্ধিমানের মতো। সময়টা সত্যিই বড় খারাপ।

কুলি সর্দারকে আবার ডাকল রবার্টস্।

—এই শোন।

—কী হুকুম হুজুর ?

—তোদের সকলকে আজ মদ খাওয়ার বাড়তি পয়সা দেব আমি। আট আনা করে বেশি মজুরী সকলের মিলবে আজকে—যা, বলে দে সবাইকে।

—জী হুজুর।

কুলি সর্দার সেলাম ঠুকল একটা। অনুগৃহীত হওয়ার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু সত্যিই কি অনুগৃহীত হয়েছে অতটা ? লোকটার চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি যেন খেলা করে গেল, ঠোঁটের কোণে যেন ঝিলিক দিয়ে গেল বিচিত্র একটা হাসির আভাস।

সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রবার্টসের।

—হাসলি যে—এই উল্লুক ?

—না হুজুর, হাসিনি তো ?

—না ? অল-রাইট।—রবার্টস গর্জে উঠল অকস্মাৎ: গেট আউট. রাস্কেল ! অর আই উইল শুট ইউ—

কুলি সর্দার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো মেরুদণ্ড খাড়া করে। শেষ ঘা পড়েছে। এরপরে আর অপেক্ষা করা চলে না। এর পরে যা করবার তাদেরই করতে হবে।

—জী হুজুর—

বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সেইদিন সন্ধ্যা।

রোজকার অভ্যাসের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছিল রবার্টস্। বেলা ডুবে আসছে—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙা করে দিয়ে জঙ্গলের ওপারে অস্তে নামছে সূর্য। চমৎকার বাতাস দিচ্ছে—শালফুলের গন্ধটা নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায়।

খট্ খট্ করে আসছে ঘোড়াটা, কাঁধে ঝুলছে বন্দুক। বনের সান্ধ্যশ্রী রবার্টসের মনটাকে প্রসন্ন আর প্রফুল্ল করে তুলেছে। গাইতে গাইতে চলেছে সে: ট্রা প্যাবেরি—ট্রী প্যাবেরি। ব্রিটিশ সম্রাজ্যের গৌরবময় অভিযান-গীতি।

দুদিকে জঙ্গল—মাঝখানে ঝোরা। তার ওপর দিকে একটা কাঠের পুল। খট্ খট্ করে বীরদর্পে ঘোড়া পুলের ওপর উঠে পড়ল। রবার্টসের গলার স্বর চড়ল আরো এক পর্দা: টী—প্যারে—রি—

কিন্তু গানটা শেষ করা রবার্টসের কপালে ছিল না।

জঙ্গলের ভেতর থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো তীর এসে বিঁধল—একটা রবার্টসের বুকে আর একটা পেটে। প্রবল কণ্ঠে একটা অভিশাপ দিয়ে আছড়ে পড়ল রবার্টস্। ছুটন্ত ঘোড়ার পা-দানীতে একখানা পা আটকে গিয়ে ঝুলন্ত মাথাটা কাঠের খুঁটিতে আছড়ে আছড়ে চুরমার হয়ে গেল, তার পরেই শেষ আশ্রয়চ্যুত হয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল বিশ ফুট নিচে কর্দমাক্ত ঝোরার মধ্যে। খট্ খট্ করে বাগানের দিকে ছুটে চলে গেল ঘোড়া, আর ঝোরার কাদাজলটা লাল হয়ে উঠল একটু একটু করে।

তার পরেই আগুন জ্বলল।

আর তারও দুদিন পরে বেলা বারোটার সময় রংঝোরা বাগানে এসে পৌঁছুল আদিত্য।

আট

ঘুম ভাঙতেই মণিকাদি তন্দ্রাজড়িত চোখে একবার সামনের শেল্‌ফের দিকে তাকালেন। টাইমপীসটা নির্ভুল নিয়মেই চলেছে, যুদ্ধের এত বিড়ম্বনার মধ্যেও ওর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ঘরের ভেতর প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে—সকালটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হল।

ঘড়ির কাঁটা বলছে সাড়ে সাতটা। মানে হাতে আর এক ঘণ্টা সময়—নটায় সময় ডিউটি দিতে হবে হাসপাতালে। মনটা বিরক্তিতে কালো হয়ে গেল। অভ্যাসবশেই ডাকলেন: খসরু!

ডাকটা আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়ল শূন্যে ঘরের মধ্যে। তন্দ্রার শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর নির্মম সত্যটা সূর্যের আলোর মতোই প্রতিভাসিত হয়ে উঠল। খসরু পালিয়েছে। সম্রাট লাল কিল্লোর শূন্য তখ্‌ত্‌-ই তাউস অধিকার করবার জন্যেই বোধ হয় চটপট উঠে পড়েছে দিল্লী এক্সপ্রেসে। অতএব—

অতএব জীবনটা একেবারে নীরস। শুধু নীরস নয়, মরুভূমি এবং সাহারা মরুভূমি। আপাতত এই মুহূর্তে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে এক পেয়ালা চায়ের জন্যে। খসরু থাকলে এখন কি আর ভাবনা ছিল? দরজায় এতক্ষণে কড়া নড়ে উঠত, খসরুর আদেশ আসত: চটপট উঠে পড়ুন দিদিমণি, জল চাপিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেত পাশের ঘরের স্টোভের গর্জন, নাকে আসত খিদে-চাগানো মাখন-মাখানো ভাজা টোস্টের গন্ধ। তড়াক করে মণিকাদি উঠে পড়তেন, নিশ্চিন্ত আরামে মন বলে উঠত: আঃ!

কিন্তু—কিন্তু এখন সে সব স্বপ্ন। যুদ্ধ মানুষের অনেক স্বপ্নকেই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, করুক—মণিকাদির আপত্তি ছিল না। কিন্তু আক্রমণটা তাঁর ঘাড়ের ওপর কেন ? উঃ—খসরু ! ব্যাটার মনে-মনে এই ছিল! এত করে খাইয়ে-দাইয়ে—এত আদর-যত্ন করে—শেষে এই কাণ্ড। নাঃ—পৃথিবীটা ভালো লোকের জায়গা নয়। সব কৃতঘ্ন—সব বিশ্বাসঘাতক।

এমনকি ঘড়িটাও। যেন ঘোড়ার মত চলেছে। একটু দাঁড়া না বাপু। মোটা মানুষ, একটু হাঁফ ছাড়তে দে। কিন্তু ছাড়তে দিচ্ছে কই। দেখতে পাঁচ-পাঁচটা মিনিট উড়ে গেল হাওয়াতে। আর দেরী করা চলে না।

মণিকাদি কম্বলটা আস্তে আস্তে সরালো গায়ের ওপর থেকে। অসম্ভব আশায় একবার অভ্যাসমতো তাকালো রান্নাঘরের দিকে। পৃথিবীতে কত মিরাকলই তো ঘটে। এমন একটা কিছু কি ঘটতে পারে না এখন ? বিবেকের দংশনে মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে খসরু। হঠাৎ তার মনে হয়েছে দিদিমণিকে এমন বিপন্ন অবস্থায় ফেলে আসা গুরুতর নৈতিক অপরাধ। আর সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে সে, লাফিয়ে উঠে পড়েছে উজানমুখী গাড়িতে। তারপর ভোর বেলা এসে নেমেছে হাওড়াতে, সোজা চলে এসেছে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের এই বাড়িতে, ঢুকেছে রান্নাঘরে, কেটলিতে জল চাপিয়ে দিয়ে ডাকছে : দিদিমণি—

কিন্তু বৃথা। কলিযুগে মানুষের বিবেক নেই—মিরাকল-এর দিনও ফুরিয়ে গেছে অনেককাল আগে। সুতরাং রান্নাঘর শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। স্টোভের শব্দ আসছে না, আসছে না পেট আর প্রাণ-জুড়োনো মাখন-মাখানো টোস্টের গন্ধ। শুধু শীতার্ত ঘরটার ভেতরে রাত্রিচর ইঁদুরের গায়ের গন্ধ যেন জমাট ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘনীভূত আর বিস্বাদ হয়ে আছে।

মোটা মানুষ মণিকাদি উঠে পড়ল। একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিলে গায়ে।

আগে চা-টা করে নিয়ে তারপর যেমন করে হোক সেদ্ধ-ভাত একটা চাপিয়ে দিতে হবে। নটার সময় ডিউটি, ভুললে চলবে না কোনো উপায়েই।

শুধু একটা সান্ত্বনা : বাঁকুড়ার ঝি-টা পালায়নি এখনো। তিনকুলে কেউ নেই, পালাবার জায়গাও নেই। তাছাড়া অন্য পেশাও তার আছে বলে মণিকাদির সন্দেহ হয়। একমাত্র সেই আছে, কলতলায় বাসন মাজছে ছরছর করে। ও পালালেও মন্দ হত না। সুখের পাত্রটা একেবারে কানায় কনায় ভরে উঠত।

গজগজ করতে করতে মণিকাদি স্টোভ ধরাল। বহু পরিশ্রমে কাপ-পেয়ালা জড়ো করলে একসঙ্গে, খুঁজে আনলে দুধ-চিনির কৌটো। তারপর চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগল : আর কতদিন এভাবে বিড়ম্বনা সহ্য করা যায়। নাকি এবারে পালাতেই হবে কলকাতা থেকে?

কিন্তু সুখ মণিকাদির কপালে ছিল না। দরজার কড়া নড়ে উঠল। হঠাৎ মণিকাদির হৃৎপিণ্ডটা উছলে উঠল একবার। খসরু ফিরে এল নাকি! আহা তা যদি হয়—

কড়া নড়ছে। নাঃ, খসরুর চেনা-হাতে মিষ্টি কড়া নাড়া এ নয়। অত সুখ ভগবান কপালে লেখেন নি। নিশ্চয় পেসেণ্ট। কপালের ওপরে বিরক্তির রেখাগুলো সংকুচিত হয়ে উঠল অর্ধবৃত্তের আকারে।

—দাঁড়ান আসছি—

এক চুমুক বাকি চা-টা গিলে নিলে মণিকা। স্কার্ফটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে গায়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিলে এক মিনিটে। শাড়ি বদলাবার আর সময় নেই, সভ্যতা-ভব্যতাও রসাতলে গেল মনে হচ্ছে।

দরজাটা খুলল মণিকা। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়ে নয়—হতভাগা হাড়-জ্বালানো মেয়ে। সুমিতা।

—ওঃ, তুই। কী মনে করে রে ?

—দর্শন দিতে এলাম।

—দরকার নেই দর্শনে।

সুমিতা ফেরবার জন্যে পা বাড়াল : চলে যাব নাকি ?

হতাশভাবে মণিকাদি বললে, লাভ কী। একটু পরেই তো আবার আসবি জ্বালাতন করতে। তার চাইতে ঘরে আয় বাপু, বোস। যা বকবক করার ইচ্ছে থাকে করে যা।

সুমিতা হাসল : বাঃ, কী চমৎকার অভ্যর্থনার ভাষা। মণিকাদি, জন্মাবার সময় তোমার মুখে কী দিয়েছিল বলতে পারো ? নিশ্চয় মধু নয় ?

—না, কুইনাইন।

—তাই দেখতে পাচ্ছি। সেই কুইনাইনের জোরেই ডাক্তার হয়েছ তো ? শিখেছ লোককে গাল দেবার তৈরি আর চোস্ত বুলি ?

—তর্ক করিসনি সুমি—ভেতরে আয়। আমাব চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হসপিট্যাল ডিউটির সময় হয়ে গেল।

দুজনে চলে এল ভেতরে। সুমিতা বললে, দিব্যি চায়ের গন্ধ বেরিয়েছে তো। নিশ্চয় একা খাচ্ছনা মনিকাদ ?

—নিশ্চয় একা খাচ্ছি। সখ থাকে বানিয়ে নাও নিজের জন্যে।

—তাতে আপত্তি নেই—সোৎসাহে সুমিতা কেটলিটা স্টোভে চাপাল।

—আর শোন্ সুমি—মণিকা আদেশ দিলে : আমার জন্যে দুটো ভাত আর ডিমসেদ্ধ বসিয়ে দিস তো লক্ষ্মীটি। এক্ষুণি খেয়ে বেরুতে হবে।

চা নিয়ে এল সুমিতা। আরাম করে বসল মণিকাদির ডেক-চেয়ারে। বললে, নাঃ, মুখটা তোমার যেমনই হোক না মণিকাদি, আতিথেয়তাটা ভালো। লোক তুমি নেহাৎ মন্দ নও দেখতে পাচ্ছি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন প্রসাধন শুরু করেছে মণিকা।

ভ্রূকুটি করে বললে, তোমার সার্টিফিকেটে আমার দরকার নেই। কিন্তু মতলব কী সেইটে আগে বলো দেখি। বিনা কাজে তো পা দাও না। আজ প্রায় সাত দিনের মধ্যে টিকিটিও দেখতে পাইনি।

—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম মণিকাদি। নতুন সংসার পেতেছি—তার দায়িত্ব কত, সে তো জানো।

—সংসার?

সবিস্ময়ে হাঁ করলেন মণিকাদি: তোর আবার কিসের সংসার রে?

—বাঃ, সেই চারতলা বাড়িটা? বিনা পয়সাতে এত বড একখানা বাড়ির মালিক হলাম, সেটা কি খালি পড়ে থাকবে নাকি? সংসার গুছিয়ে নিতে হবে না?

—সংসার গুছিয়ে নিলি? বর পেলি কোথায়?

—বর জুটল না—হঠাৎ সুমিতার প্রসন্ন হাসিটা যেন ম্লান হয়ে এল: কিন্তু বর না থাকলে কি আর সংসার হয় না? একবার গিয়ে দেখে এসো না—দেখলে আব ফিরতে চাইবে না।

—দরকার নেই দেখে—ঐকান্তিক তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করলে মণিকা: কতগুলো বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়ে জুটিয়ে নিয়ে ওখানে পলিটিক্স করছিস তো। সবশুদ্ধু একদিন জেলে যাবি, এই একখানা কথা বলে রাখলাম।

সুমিতা বললে, তা তো যাবই। কিন্তু তুমি অ্যাপ্রুভার হয়ো, গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না—বরং পরকালের কাজ হয়ে যাবে।

কী ভেবে হঠাৎ মুখ ফেরালো মণিকা।

—একটা কথা শুনবি সুমিতা?

—কী কথা?

—বল, শুনবি কথাটা?

সুমিতা হেসে ফেলল : মুখ অত গম্ভীর করছ কেন ? ভাবটা যেন বলে ফেলবে সাসপেক্টেড 'টি-বি'র লক্ষণ দেখছ।

—না :, ঠাট্টা নয়। —মণিকার মুখে গাম্ভীর্যের মেঘ তেমনি ঘন হয়েই রইল : আমার কথাটা শোন্। বিয়ে করে ফেল।

—বিয়ে! —সুমিতার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এমনভাবে চমকে উঠল যে, আর একটু হলে হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটাই আছড়ে পড়ত ঝনঝন করে।

—হ্যাঁ, বিয়ে। এসব করে কোনো লাভ নেই।

জোরে—অনেকটা যেন জোর করেই, সুমিতা হেসে উঠল : মণিকাদি আজকাল ডাক্তারী ছেড়ে ঘটকালির পেশা নিয়েছ নাকি ? কিন্তু আমাকে ঝোলাবার চেষ্টা করছ কেন ? নিজের ইচ্ছে হয়ে থাকে বলো, আমি পাত্র জুটিয়ে আনি।

—বয়েস নেই, থাকলে তোর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতাম না। কিন্তু তোর তো সময় যায় নি। শোন্ সুমি, এর পরে যেদিন ক্লান্ত হয়ে উঠবি সেদিন বুঝবি কী হারালি জীবন থেকে।

সুমিতা বললে, তোমার উপদেশ মনে থাকবে। কালই কাগজে বিজ্ঞাপন দেব 'পাত্র চাই' বলে। দেখি কোন্ ময়ূর-চড়া কার্তিক বরমাল্য নিয়ে আসে আমার জন্যে।

মণিকাদি বললেন, আচ্ছা, বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

—কিছু না। কিন্তু আমার এমন কপাল মণিকাদি—বর আর ধরা দিল না, ছিটকে পালিয়ে গেল। তাইতো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—অলিতে-গলিতে, আলোয়-অন্ধকারে। যদি কোনোদিন ধরা দেয়, তুমি খবর পাবে বৈকি। কিন্তু এ যাত্রা বোধ হয় নিতান্তই শ্মশান-বাসর।

সুমিতা হঠাৎ উঠে পড়ল : দেখি তোমার ভাতটা হয়ে গেল কিনা।

ভাত কিন্তু সত্যিই হয়নি। চড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাত যে ফোটে না, এ কথাটা মণিকাও জানে, সুমিতাও জানে। তবু সুমিতা সরে এল—পালিয়ে এল। কাল সারারাত মনের মধ্যে ঘুরেছে রমলা আর বাসুদেবের কথা। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু বুক ফেটে মরে গেলেও অনিমেষ ফিরে তাকাবে না। ফুলের মধ্যে তার বজ্র লুকিয়ে আছে।

অন্যায় হচ্ছে—অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছে এলোমেলো ভাবনাগুলো। এ উচিত নয়, একে দমন করা দরকার। চারতলা বাড়ির অত বড় সংসারের মধ্যেও মনটাকে সে তলিয়ে দিতে পারছে না, থেকে থেকে বিদ্রোহ করে উঠছে। সেকি দুর্বল—রমলার চাইতেও দুর্বল ?

আজ সকালে সে কেন ছুটে এল মণিকাদির এখানে ? কী প্রয়োজন ছিল ? এইখানেই অনিমেষের সঙ্গে তার শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল বলে ? সাতদিন হতে চলল আদিত্যদার কোনো খবর নেই, অনিমেষেরও না। সে কি অচেতন মনের ভেতর থেকে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এখানে এলেই ওদের কিছু একটা খবর পাওয়া যাবে ? হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অভিশপ্ত, অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল সুমিতার। এগোতে পারছে না, পিছিয়ে যাবারও উপায় নেই। একি বিড়ম্বনা পেয়ে বসল তাকে ?

মণিকাদির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। সুমিতা শুনতে পেল মণিকা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। তার পরেই তীব্র উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় মণিকা ডাকলে, সুমি !

সুমিতা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। সমস্ত চেতনাটা চকিত হয়ে উঠেছে। টেলিফোনে কার খবর এল কে জানে। আদিত্যের, না অনিমেষের ?

—কী হল মণিকাদি ?

—একটা ভয়ানক দুঃসংবাদ আছে সুমি ?

সুমিতার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। কথা বলতে পারল না, শুধু মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিহ্বলভাবে।

—শীলা আফিং খেয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছে আমাকে।

মনের ভেতর থেকে ভয়ের গুরুভার পাথরটা নেমে গেল, কিন্তু জেগে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। সুমিতা বললে শীলা? কোন্ শীলা?

—আমাদের শীলা রে। সেই যে শশাঙ্ক লাহিড়ীর—

—বুঝতে পেরেছি। —সুমিতার গলায় বেদনার সুর ফুটে উঠল: কিন্তু অমন শান্তশিষ্ট মেয়েটা আফিং খেতে গেল কেন? শশাঙ্ক কী করছে?

—শশাঙ্কের কোনো খবর নেই।

—খবর নেই?

—না, পালিয়েছে। কলকাতায় বোমা পড়বে—সেই ভয়ে আগে থাকতেই তার দামী দুর্মূল্য জীবনটা নিয়ে চম্পট নিয়েছে।

কয়েকটা মুহূর্তের স্তব্ধতা। দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। শশাঙ্ক লাহিড়ী পালিয়েছে। বাবের মতো অসবর্ণ বিয়ে করে—বাপের অত বড় সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে সমাজে একটা আদর্শ স্থাপন করেছিল শশাঙ্ক। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে এবং এই যুদ্ধের সুযোগে শশাঙ্ক সে-সীমাটাকে বুঝে ফেলেছে। বহু কষ্টে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ থেকে সংগ্রহ করা দামী দুর্লভ প্রাণ। তাকে এত সহজে হারালে চলবে না, এবং জীইয়ে রাখলে ভবিষ্যতে অনেক শীলা আসবে। কারণ শশাঙ্কের রূপ আছে, শশাঙ্কের টাকা আছে এবং শশাঙ্কের অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে।

সুমিতা হঠাৎ হেসে উঠল।

—যাক, বিবাহিত জীবনের চরম পুরস্কার পেল শীলা। এর পরে আমার পত্রপাঠ বিয়ে করে ফেলা উচিত, কী বলো মণিকাদি?

মণিকা কথা বললে না, ব্যথায় সমস্ত মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার পরেই পায়ে গলিয়ে নিলে একটা স্যাণ্ডাল, হাতে তুলে নিলে তার ডাক্তারী ব্যাগটা।

—একবার যাবি সুমিতা? দেখে আসবি?

—চলো। বাঁচবে তো?

—জানি না। ওরা স্টমাক পাম্প দিয়েছিল, কিন্তু বেশি তুলতে পারে নি। অনেকটাই কনজিউম করে ফেলেছে তার আগে। মরুক, ওর মরাই ভালো—। অনেক কষ্ট পেয়েছে, এবার রক্ষা পাবে।

ঘরে তালা দিয়ে দুজনে রাস্তায় নেমে এল। নির্জন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। বন্ধ আর শূন্য বাড়িগুলো যেন ভয়াতুর চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে শূন্য দিগন্তের চক্রবালে—যেখানে মৃত্যুবজ্র বহন করে জাপানী বিমান দেখা দেবে। লোহার বিচ্ছিন্ন বেঞ্চগুলো সব ফাঁকা—মরা ঘাসে রাত্রির শিশির ঝিকমিক করছে। ব্যথাবিদীর্ণ ভয়ার্ত কলকাতার চোখের জল যেন ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দিকে দিকে।

প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ট্রাম ধরতে হবে—ওখান থেকে বেলগাছিয়া।

—খেয়ে নিলে না মণিকাদি?

—এসে খাব। —মণিকার স্বর ক্লান্ত শোনালো।

সুমিতা ভাবছে শীলার কথা। অবশ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, তবু চিনত শীলাকে। ছোট্ট একটুকরো মেয়ে—। কথা বলে না, চুপ করে শোনে, মিষ্টি করে হাসে। ভীরু চোখ, শান্ত স্বভাব। বলার চাইতে অনুভব করে বেশি। লেখাপড়া শিখেছে, তবুও গৃহকপোতী। পথে নামলে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়—বাইরের পৃথিবীটাকে ভয় করে, নিজেকে অনুভব করে একান্ত অসহায় বলে। তিনপুরুষ কলকাতায় কাটিয়েছে, তবু চাল-চলন দেখলে মনে

হয় যেন গ্রামের একটি ছোট মেয়েকে হঠাৎ মহানগরীর এই জীবনস্রোতের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে—এখানে সে যেমন বেমানান তেমনি অসঙ্গত।

সেই শীলা। হঠাৎ এ কী করে বসল। অমন ভীরু ছোট মেয়েটা—পরিবারের শাসন মানল না, বাঘের মতো বিশুদ্ধ ব্যুরোক্র্যাট বাপের তর্জনকে ভয় করল না, সমাজকে অস্বীকার করল, বেরিয়ে এল শশাঙ্কের হাত ধরে। সেদিন সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—জলভরা মেঘে যে প্রচ্ছন্ন বজ্র থাকে, এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এই জোরটা কি এসেছিল শীলার নিজের ভেতর থেকেই? না—এই শক্তি সে পেয়েছিল শশাঙ্কের কাছ থেকে, পেয়েছিল তার প্রেম থেকে? ভালোবাসা শীলার জন্মান্তর ঘটিয়েছিল, ভীরু মেয়েটির ভেতর থেকে আর একজনকে জাগিয়ে তুলেছিল—যে কাউকে ভয় পায় না—পৃথিবীকেও নয়, সমাজকেও নয়।

নিশ্চয় তাই—সুমিতা ভাবতে লাগল : নিশ্চয় তাই। নিজের জীবনেও এই সত্যটাকে সে বুঝতে পেরেছে। অ্যাডোনিসের ভেতরেও হার্কিউলিস জাগে। লীলাসঙ্গিনী হয় বিপ্লবী-নায়িকা। হাত থেকে লীলাকমল ঝরে গিয়ে সেখানে আসে তলোয়ার। সে তলোয়ার অগ্নিদীপ্ত—বজ্রের চাইতেও গুরুভার। তবু তাকে বহন করতে হয়, সেই দানকে গ্রহণ করতে হয়। 'কী পেলি তুই নারী' বলে আক্ষেপ করা বৃথা—চোখের জল মূল্যহীন।

কিন্তু নিজের কথা থাক। শীলা। ভুল করেছিল। শশাঙ্ক ওকে লীলা-কমল দেয়নি, তলোয়ারও নয়। যা দিয়েছিল, তা বঞ্চনা। তাই আজ নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে শীলাকে। আফিং খেয়েছে। হয়তো বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না।

মণিকাদির অসন্তুষ্ট গুঞ্জনে চমক ভাঙল সুমিতার।

—মোটা মানুষ, হাঁটতেও পারি না ছাই। একটা রিক্সা যদি পাওয়া যেত—

কিন্তু বৃথা আশা। রিক্সা আছে, চলছেও অনেক, কিন্তু সব উজানের স্রোতে। ব্যাক্স-প্যাটরা আর ব্যাক্স-প্যাটরার সামিল মানুষ। হাওড়া-শেয়ালদার মুক্তিপথ দিয়ে খাঁচায়-বন্দী মহাপ্রাণীগুলো উড়ে পালাচ্ছে। চার আনার রিক্সা আড়াই টাকা।

মণিকা বললে, কী আর করবে, হেঁটেই চলো—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভাবটা এই : যেন সুমিতারই কষ্ট হচ্ছে—তাকে একটা রিক্সাতে চাপিয়ে দিতে না পারলে মণিকার মন শান্তি পাচ্ছে না।

সুমিতা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, চলো, আর দু-পা রাস্তা—এক্ষুণি তো ট্রাম পাবে।

—অগত্যা।

শীলা। সুমিতা ভাবছে : এই যুদ্ধ অনেক সত্যকে অনাবৃত করল, মুখোস খুলে দিলে অনেক মিথ্যার, উজ্জ্বল আর নির্মল করে তুলল অনেক বিভ্রান্তিকে। যেন সুমিতা বেঁচে গেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে কাল সারারাত্রির বিনিদ্র অস্বস্তিটার ওপর থেকে। ভালোই করেছে অনিমেষ—রক্ষা করেছে একটা স্বপ্নভঙ্গ থেকে—হয়তো শীলার মতো আফিংয়ের হাত থেকেও।—সেও তো রোমান্টিক ছিল, তারও তো এই রকম বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ছিল। কিন্তু অনিমেষ নিজেকে বাঁচিয়েছে, তাকেও বাচিয়েছে। লীলাকমল নাই রইল—নাই-বা রইল পদ্মপর্ণে নিজের স্বপ্ন-কামনার রক্তরাগ। তার চাইতে ঢের বড় সত্য হাতের এই তলোয়ার। আত্মরক্ষা করতে পারে, আঘাত করতে পারে—আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নিঃশব্দে পথ কাটতে লাগল। সুমিতা ভাবছে—মণিকাও ভাবছে। গাড়ির স্রোত চলেছে স্টেশনের দিকে, ওই পথ দিয়েই পালিয়ে গেছে শশাঙ্ক। পালিয়ে গেছে অনেক অসত্য—অনেক মিথ্যা—অনেক অভিনয়ের নিপুণ আর নিখুঁত চতুরতা।

মোড়। ট্রাম এল। যাত্রীর ভিড় নেই—দুজনে তেমনি নীরবে ট্রামে উঠে বসল।

হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো সুমিতা। ন'টা বাজে। তার সংসার এখন মুখরিত। ছেলেমেয়েরা একদল খেয়ে-দেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে। ওদের শীলার কথা ভাববার সময় নেই—সুমিতার হৃদয়ের কথাও না। তার চাইতে ঢের বড়ো, অনেক বড়ো কথা ওরা ভাবছে। দেশ। দেশ ছাড়িয়ে মহাদেশ, মহাদেশ ছাড়িয়ে পৃথিবী। ওরা সেই দিনটাকে স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছে—যেদিন পৃথিবীতে সব মিথ্যা—সব অপমান—সব উৎপীড়নের সমাপ্তি হয়ে গেছে—যেদিন শীলারা এত সহজে ভুল করে না, আর যদি ভুলই করে, তাহলে আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এদের নিয়েই সুমিতার সংসার—এদের স্বপ্নই আগামী কালের, আগামী পৃথিবীর সংসার।

আর শীলার সংসার। ঠুনকো কাচের মতো ভেঙে পড়ল মাত্র একটি আঘাতে। এতটুকু ভর সইল না। চোরাবালির বনিয়াদ শিথিল হয়ে এক মুহূর্তে মাটির তলায় টেনে নিয়ে গেল দুজনকে।

মনের দিক থেকে হঠাৎ যেন জোর পেল সুমিতা। হঠাৎ যেন পুঞ্জীভূত আলস্য আর জড়তা—দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে সে পথ খুঁজে পেল। সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। শীলার সংসার ভাঙবে না—মরবে না শীলা। সে বেঁচে উঠবে—সামগ্রিক সংসারের নতুন ইঙ্গিতে—নতুন সম্ভাবনায় ধন্য হয়ে উঠবে।

শীলা মরবে না।

কিন্তু শীলা বাঁচল না। ওরা যখন পৌঁছুল, তার দশ-পনেরো মিনিট আগেই শীলা মরে গেছে। হাসপাতালের লোহার খাটে শাদা-চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে সে ঘুমিয়ে আছে। স্টমাক-টিউব বসানোর চেষ্টায় গালের একদিকে একটুখানি চিরে গিয়েছিল—সেখানে একটুখানি কালো রক্ত জমাট

বেঁধে আছে শুধু। আর কোনোখানে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই—ঘুমিয়ে আছে শীলা। শশাঙ্ককে নিষ্কণ্টক করেছে, নিজেকে ভারমুক্ত করেছে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মণিকাদি। সুমিতা শুধু চিত্রকরা চোখে তাকিয়ে রইল শীলার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে।

ডাক্তার বললেন, ঢের চেষ্টা করা হয়েছিল মিস সেন—বাঁচানো গেল না। অনেকটা আফিং খেয়েছিল, খবরও পাওয়া গিয়েছিল ঢের দেরীতে। ততক্ষণে রক্তের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার বললেন, শুধু আত্মহত্যাই করেনি, সি হ্যাজ অলসো কিল্ড এ চাইল্ড উইথ হার।

আবার একটা আর্তনাদ। এবার শুধু মণিকা নয়, সুমিতাও।

শীলা মরে গেছে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করে গেছে শশাঙ্কদের পাপ—শশাঙ্কদের বীজাণু। বড়লোক শশাঙ্ক—অভিজাত শশাঙ্ক, মেয়েদের জীবন নিয়ে যারা অসঙ্কোচে ছিনিমিনি খেলতে পারে সেই শশাঙ্ক। কিন্তু এক শীলাই কি নিজেকে বলি দিয়ে নীল রক্তের এই অভিশাপকে ধ্বংস করতে পারবে? এত সহজেই কি এর সমাপ্তি? সুমিতা ভাবতে লাগল: এত সহজেই কি এই রক্তবীজেরা পৃথিবী থেকে যাবে অপসৃত আর নিশ্চিহ্ন হয়ে?

খোলা জানলা দিয়ে সূর্যের আলো শীলার মুখে এসে পড়েছে। এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ওই সূর্য—পৃথিবীর আদিম দিনে তামসবিজয়ী যে সূর্যকে অগ্নিমন্ত্রে বন্দনা করা হয়েছিল, অন্ধকারের পরপার থেকে অমৃতরূপে যে হিরণ্ময় দ্যুতির আবির্ভাব—যার ত্রিকালদর্শী নিরঞ্জন দৃষ্টি অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে।

* * *

রমলার ঘুম ভাঙল কবি ইন্দুর কণ্ঠস্বরে।

রাত্রির সেই ভীরু লাজুক কবিটি আর নেই। এখন ওর মধ্যে দ্বিতীয়

সত্তা জেগেছে। চিৎকার করে সমস্ত বাড়িটা মাথায় করে তুলেছে, মনে হচ্ছে যেন মারামারি বাধিয়েছে। কিন্তু মারামারি নয়, কাকে যেন একটা প্রাণপণে দুরূহ রাজনীতির জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানালোক বিতরণ করছে।

রমলা ঘর থেকে বেরিয়ে বললে, কী শুরু করেছ ইন্দু? মানুষকে কী একটু ঘুমোতে দেবে না?

ইন্দু বললে, বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোবে মানে? ওসব জমিদার-গিন্নির চাল ছাড়ো।

—না, শেষ রাত্রে উঠে তোমার মত চ্যাঁচাতে শুরু করব। কবির ইমোশনটা যখন রাজনীতির ওপর গিয়ে পড়ে, তখন তার চাইতে মারাত্মক দুর্ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটতে পারে না।

ইন্দু বললে, যাও—যাও।

—বটে?—রমলা হাসল: তাহলে শোনো:

হংস মিথুন, নীড়ের ঠিকানা কই—

অসীম সাগর—

ইন্দুর কান লাল হয়ে উঠল: রমলাদি, থামো।

—থামব মানে? -আড়চোখে কবির বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রমলা বলে চলল: অসীম সাগর দুলিছে পাথার নিচে—

প্রচণ্ড বাজনৈতিক ইন্দু মুহূর্তে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। আলোচনার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। দেখতে দেখতে সামনে থেকে পালিয়ে মান এবং কান বাঁচাল। ওর পলায়ন দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল রমলা। কত সহজেই মানুষটাকে যে বিব্রত করে তোলা যায়!

সুমিতার ঘরের সামনে এসে ডাকলে, সুমিতাদি!

ঘর থেকে বেরুল শোভা: সুমিতাদি সকালে বেরিয়ে গেছে।

—কখন ফিরবে?

—বলে যায়নি।

রমলা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা অদ্ভুত দো-টানায় বুকের ভেতর তোলপাড় করছে। সুমিতা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন তার নোঙর ছিঁড়ে গেছে—এই স্রোতের ভেতরে নিজেকে সে সামলাতে পারছে না। সুমিতা যেন ওর শক্তি—ওর আশ্রয়। একদিকে বাসুদেব, অন্যদিকে আদর্শ। কোন পথে যাবে সে—আত্মরক্ষা করবে কী উপায়ে?

বাসুদেবের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট। রমলা করেনি, বাসুদেবই করেছে। বলেছে, কাল আটটার মধ্যে আসবে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণায়। আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকব। যদি না আসো, তাহলে জীবনে আর কোনোদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলেছে বাসুদেব। বুকে হাত দিয়ে, চোখের কোণা ছলছলিয়ে, গলার স্বরে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অনিবার্য ইঙ্গিত এনে। সুমিতার কথা সত্যি, খানিকটা অভিনয় করেছে বাসুদেব। কিন্তু সবটাই অভিনয় নয়। নিজের কথাটাকে প্রাণ দিয়ে বোঝাতে গেলে খানিকটা অভিনয় আসবেই—এটা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য।

বাসুদেবের চোখে কাতরতা—বাসুদেবের সমস্ত মুখ একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে নিষ্ঠুর। বেশ বোঝা যাচ্ছে, রমলাকে না পেলে নিজেকে ক্ষমা করবে না, নিজের ওপর একটা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে আছে। কথাটা কল্পনা করেও রমলার অন্তরাত্মা চমকে উঠল।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। আর আধঘণ্টা সময়। যাবে কি যাবে না? আদর্শ আর সঙ্কল্পকে একেবারে বিসর্জন দেবে, না বাঁধা পড়বে বাসুদেবের জীবনে? এ সময়ে সুমিতা থাকলে কাজ হত। সুমিতার মধ্যে শক্তি আছে—জোর আছে। তবু—

তবু মনে হয়েছে সুমিতাও একেবারে খাঁটি নয়। কোথায় যেন তারও ভাঙন আছে, অন্তত কাল রাত্রে তাই মনে হল। কাকে ভালোবেসেছে সুমিতা? আদিত্যদাকে? কে জানে।

কিন্তু কী করবে রমলা? বাসুদেব প্রতীক্ষা করবে। যদি না যায়, তাহলে বাসুদেব কী করে বসবে, কে জানে। তার জন্যে একটা মানুষ অসময়ে জীবনটাকে শেষ করে দেবে—নাঃ, অসম্ভব। অন্তত একবার দেখা করে আসা যাক, একবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক যে এম-এ পাশ করে কলেজের অধ্যাপক হয়ে এসব ছেলেমানুষি শোভা পায় না। জীবনটাকে সহজভাবে দেখতে শিখুক বাসুদেব, বুঝতে শিখুক যে—

একটা অজ্ঞাত টানেই রমলা বেরিয়ে পড়ল।

বাসুদেব ঠিকই অপেক্ষা করছিল, ঘন ঘন অধৈর্যভাবে তাকাচ্ছিল হাতের ঘড়িটার দিকে। রমলাকে আসতে দেখে তার আগ্রহ-ব্যাকুল দুই চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল।

—এসেছ?

রমলা ম্লান বিষণ্ণ গলায় বললে, হাঁ আসতেই হল।

বাসুদেব বললে, চলো।

—কোথায় যেতে হবে?

—চলো, কথা আছে।

একটা ট্যাক্সি নিলে বাসুদেব। দুজনে এল চৌরঙ্গীতে—ঢুকল একটা নিরিবিলি ছোট রেস্তোরাঁয়।

রমলা বললে, আমি কিছু খাব না।

—খাবে না? বেশ, আমিও খাব না।

—অমনি রাগ হল? আচ্ছা, তাহলে চা নাও দু পেয়ালা।

চায়ের কথা বলে দিয়ে বাসুদেব একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল রমলার

দিকে। তারপরে সোজা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী ঠিক করলে ?

রমলা টেবিলটার ওপরে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল, জবাব দিল না।

বাসুদেব নাছোড়বান্দা। বললে, কী ঠিক করলে ?

—তুমি ফিরেই যাও।

—আর তোমার কিছু বলবার নেই ?

রমলা বললে, না। —তার গলা কাঁপতে লাগল।

—আমার চাইতেও তোমার কাজ বড ?

রমলা আবার চুপ করে রইল। একথার জবাব দেবে কি, জবাবটা তার নিজেরই জানা নেই। কে বড, কে ছোট এটা যদি বুঝতে পারত তাহলে অনেক আগেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে। বুঝতে পারেনি বলেই তো এই বিপত্তিটা দেখা দিয়েছে।

—স্বীকার করি, যে কাজ তুমি করছ, তার দাম আছে। নিজের দেশকে ভালোবাসি না, এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই—বাসুদেবের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল : কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব কাজ সকলের জন্যে নয়। আমাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেবার কী অধিকার তোমার আছে, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে তোমার মুখ থেকে জানতে চাই রমলা।

রমলা মুখ তুলল। গালের দুপাশে উত্তেজিত রক্তের কণিকা এসে জমেছে। সে নিজেই দুর্বল —নিজের কাছে নিজেই একান্তভাবে অসহায়। বাসুদেবকে কেমন করে সংযত করবে, কেমন করে জয় করবে ?

—কিন্তু আমি ছাড়া আরো তো মেয়ে আছে—রমলা আস্তে আস্তে বললে কথাটা। কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন অপরিচিত আর বেখাপ্পা ঠেকল। সত্যিই আজ যদি সে শুনতে পায় যে, বাসুদেব আর

একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে, তাহলে মনের দিক থেকে সে কি সুখী হতে পারবে একবিন্দুও ?

বাসুদেব উত্তেজিত গলায় বললে, মেয়ে অনেক আছে, কিন্তু তাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি নি। অনর্থক ওসব কথা বোলো না রমলা, অকারণে আমাকে আঘাত দিয়ো না।

রমলা বললে, আঘাত কেন পাও ? কেন সহজভাবে বিদায় করে দিতে পারো না আমাকে ? তোমার জীবন থেকে, তোমার কামনা থেকে ?

বাসুদেব যেন হিংস্র হয়ে উঠল : সেইখানেই তো আমার কাল হয়েছে। তা যদি পারতাম, তাহলে কোনো সমস্যাই আজকে আর দেখা দিত না। অবজ্ঞা করতে পারি না, ভুলতে পারি না, আঘাত করে সান্ত্বনা পাই না। ওতেই আমার মরণ হয়েছে—

বাসুদেব আরো কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। চায়ের ট্রে নিয়ে ক্যাবিনের পর্দা সরাল বেয়ারা।

রমলা পেয়ালায় চা ঢালল। একটা চুমুক দিয়ে বাসুদেব বললে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। অনেক বিরক্ত করেছি, আর করব না। আজ শুধু শেষ কথাটা শুনে যেতে চাই।

রমলা মৃদু গলায় বললে আমার কথা তো শুনেইছ। অনেক কাজ—অনেক দায়িত্ব। এখন সব ফেলে দিয়ে নিজের সুখ আমি বেছে নিতে পারব না।

বাসুদেব খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তার হতাশাক্ষিপ্ত জ্বলন্ত চোখের আগুন যেন দগ্ধ করতে লাগল রমলাকে। আর রমলা রইল মাথা নত করে বাসুদেবের ওই অগ্নিময় চোখের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই শুধু দুজনের চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের সুরভিত ধোঁয়া কতগুলো এলোমেলো সর্পিল রেখায় উঠে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর কানে আসছে চৌরঙ্গীর ট্রাফিকের অবিরাম গর্জন।

বাসুদেব বললে, এই শেষ কথা ?

রমলা জবাব দিল না।

বাসুদেবের মুখে দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা কঠিনতা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট শিশি সে বের করে আনল। নীল রঙ, চ্যাপ্টা ছিপি।

—দেখেছ ?

—এ কী !

রমলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন গলায় বাসুদেব বললে, হাইড্রোসায়ানিক। ভালো জিনিস, বেশি সময় লাগবে না।

সভয়ে রমলা বাসুদেবের হাত আঁকড়ে ধরল, না, না।

বাসুদেব তেমনি নিরাসক্ত গলায় বললে, তোমার ক্ষতি কী ! তোমার আদর্শ আছে, সংকল্প আছে। এ তোমার মনেও থাকবে না। পৃথিবীতে কত মানুষই তো প্রত্যেক দিন এমনি করে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে কে আর চোখের জল ফেলতে যাচ্ছে বলো ?

এতক্ষণে রমলা বাসুদেবের হাত থেকে জিনিসটাকে আয়ত্ত করে ফেলেছে। বাসুদেব কিন্তু জোর করেনি, খুব সামান্যতেই তার হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে।

রমলা বললে, না।

—আমাকে মরতেও দেবে না ?

—না।—রমলার চোখ এবারে জ্বলতে লাগল : ভেবেছ ইচ্ছে করলেই মরতে পারো তুমি ?

—আমার ওপরে তোমার দাবী আছে ?

—অন্তত যতদিন আমি বেঁচে থাকব।

আধ ঘণ্টা পরে সেই ট্যাক্সিটাই আবার বেরিয়ে পড়ল রাজপথে। চলো গড়ের মাঠে, চলো লেকে। যুদ্ধ এসেছে, দুর্দিন এসেছে—তাতে ক্ষতি কী। জীবন এখনো রিক্ত হয়ে যায় নি—প্রেমের মৃত্যু ঘটেনি এখনো। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ব্যথার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয় ভালোবাসা ধ্রুবতারার মতো চিরজাগ্রৎ হয়ে আছে।

নয়

আদিত্য যখন রংঝোরা বাগানে এসে দাঁড়ালো, তখন সেখানে একেবারে প্রলয় কাণ্ড চলেছে।

রবার্টসের বিকৃত মৃতদেহটা জলের থেকে তুলে আনা হয়েছে পরদিন সকালে। খবর গেছে থানায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে পুলিশ। ব্যাপারটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে একে ফেলা চলবে না, এর ভেতরে বিরাট একটা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। শহরের পথঘাটে, মিলে, ফ্যাক্টরীতে দিনের পর দিন যে আগুন অলক্ষ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে—এ তারই একটি বহিঃস্ফুলিঙ্গ। সুনিশ্চিত এবং আশঙ্কাজনক।

রবার্টসকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু শুধু রবার্টসকে নয়—এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটা প্রবল ও প্রকাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। অপমানিত মানুষের রক্তে রক্তে দুলে উঠেছে—শ্রেণী-সংঘাতের সাড়া। বিপ্লবের লাল ঘোড়া দিগন্তের আকাশে ঝোড়া মেঘের কেশর ফুলিয়েছে। এখন থেকে এর প্রতিবিধান না করলে কল্পনাতীত পরিণাম অপ্রত্যাশিত নয়।

ওদিকে বর্মা-ফ্রণ্টে দুঃসংবাদ। রেঙ্গুনের পতন হয়েছে, মান্দালয়ের ওপরে চলেছে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। মিত্রবাহিনী এক পা এক পা করে "শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিকল্পনা-অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ" করছে আসামের দিকে। ব্রিটিশ সিংহ ঔপনিবেশিক সুপ্তি-গুহা থেকে চমকে জেগে দেখতে পাচ্ছে সামনে বন্দুকের উদ্যত নল!

সুতরাং ঘরের বিদ্রোহ আগে দমন করা দরকার। বাইরের আঘাতে

যখন চারদিক টলমল করছে, তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতটাও নড়ে ওঠে, তাহলে পরিণামে ইংলিশ-চ্যানেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উইনস্টন চার্চিলের মেঘমন্দ্র আশ্বাসবাণীতেও নয়।

রবার্টসের হত্যার মধ্যে এতগুলি সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

চারদিকে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে ইয়োরোপীয়ান প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন। এই যদি সূত্রপাত হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি সত্যি সত্যিই লালবাতি জ্বালিয়ে লিকুইডেশনে গেল নাকি? ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়ানদের নিশ্চিত ব্যবসা বাণিজ্যকেও কি এমনি করেই লালবাতি জ্বালতে হবে? এর মধ্যে নীল বিদ্রোহের পূর্বাভাস লুকিয়ে নেই তো?

অতএব থানা আর সদর উজাড় করে পুলিস এসে পড়েছে।

ইতিমধ্যে আদিত্য এসে পৌঁছেছে রংঝোরা বাগানের দরজায়। একরাত একবেলা অসহ্য ট্রেনের কষ্ট গেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে কিছু পড়েনি। তার ওপর তিন মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে—ক্লান্তিতে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়ছে আদিত্যের।

কিন্তু বাগানের গেটের সামনেই জমেছে লাল-পাগড়ী। সেই সঙ্গে একদল কুলি। শহরের ইয়োরোপীয়ান ডি-এস-পি একখানা টেবিল পেতে নিয়ে জেরা করছেন তাদের। যেটা বাঙলাতে ভালো আসছে না, সেটার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন দারোগা এবং যাদব-ডাক্তার। বাগানের অন্যান্য বাবুদের চাইতে পুলিসের সহযোগিতায় যাদব ডাক্তার বেশী অগ্রণী। রবার্টস তাকে লাথি মেরেছিল—সে ব্যথাটা এখনো মিলিয়ে যায়নি, তাই বলে যাদব ডাক্তার অকৃতজ্ঞ নয়। রবার্টসের অনেক প্রসাদ পেয়েছে সে—হুইস্কির সে সব ঋণ যদি সে বেমালুম ভুলে বসে থাকে তাহলে অধর্ম হবে যে। পরকালে সে কী বলে জবাবদিহি করবে।

ডি-এস্-পির চোখে আগুন জ্বলছে। টেবিলের ওপরে তিনি টোটাভরা রিভলভারটা খুলে নামিয়ে রেখেছেন। ওর একটা মনস্তাত্ত্বিক সার্থকতা আছে। ইংরেজ রাজত্ব যে এখনো বানচাল হয়ে যায়নি, ওটা তারই নিদর্শন। দরকার হলে ডি-এস-পি এই মুহূর্তে ওটাকে হাতে তুলে নিতে পারেন—সব কটা ব্লাডি নিগারকে একেবারে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু ডি-এস-পি বলেছেন, তিনি অত্যন্ত সদাশয় লোক বলেই তা করবেন না। ইংরেজ সরকার বিচার করে—প্রতিহিংসা নেয় না। সুতরাং কুলিরা যদি অপরাধীদের খবরটা দিয়ে দেয়, তাহলেই সমস্ত জঞ্জালটা মিটে যাবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে তাদের অদৃষ্টে যে বিস্তর দুঃখ আছে, এ নিশ্চিত।

এই সময়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়ালো আদিত্য। জিজ্ঞাসা করলে, এই কি রংঝোরা বাগান?

ডি-এস-পি উঠে দাঁড়ালেন বিদ্যুৎবেগে। আদিত্যের সমস্ত অবয়বের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা দেখে অনায়াসে অনুমান করা চলে যে লোকটি বিপজ্জনক। বজ্রকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইজ দ্যাট?

মুহূর্তে আদিত্য বুঝতে পারল, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

—এটা কি রংঝোরা বাগান?

—হ্যাঁ—তুমি কী চাও?

—অনিমেষ ব্যানার্জিকে।

—অনিমেষ ব্যানার্জি!—ডি এস-পি বললেন, অল্ রাইট। আই হ্যাভ্ এ ক্লু। তোমার নাম কী?

—আদিত্য রায়।

—অল্ রাইট মিস্টার আদিত্য রায়, আই অ্যারেস্ট ইউ।

অপরিসীম বিস্ময়ে আদিত্য বললে, অ্যারেস্ট? কেন?

—এই বাগানের ম্যানেজার লিওপোল্ড রবার্টসের হত্যা সম্পর্কে।

ভয় পেল না আদিত্য, হতবুদ্ধি হয়ে গেল না। শুধু অসীম বিস্ময়ভরে সে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * *

আদিত্য বাগানে পৌঁছেছে এই খবরটা যখন ধরমবীর পেল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আদিত্যকে গ্রেপ্তার করে ইন্সপেকসন বাঙলোতে রাখা হয়েছে, তাকে যথাসময়ে সদরে চালান করে দেওয়া হবে।

অসহায়ভাবে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল ধরমবীর। একটু আগে যদি জানতে পারত, তাহলে কখনও এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারত না। হয় নিজে স্টেশনে যেত অথবা লোক রাখত সোজা আদিত্যকে নিয়ে আসত তার গোলায়। কিন্তু আদিত্য যে এমন হঠাৎ বাগানে এসে পৌঁছে যাবে, একথাই বা কে কল্পনা করতে পেরেছিল।

শুনে অনিমেষের মুখ পাংশু হয়ে গেল। তিনদিন পরে আজ সে বিছানার ওপরে উঠে বসতে পেরেছে। খবরটা যখন এসে পৌঁছুল, তখন একটা কাপে করে সে দুধ খাচ্ছিল। খবর পাওয়া মাত্র হাত থেকে কাপটা ঝন্ ঝন্ করে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, কাঠের মেজে দিয়ে গড়িয়ে চলল দুধের স্রোত।

অনিমেষ বললে, আমি যাব।

ধরমবীর কাছে এসে দাঁড়ালো। একটা হাত রাখলে অনিমেষের কাঁধে। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

—বাগানে।

—কেন?

—আদিত্যদাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে।

—তুমি গিয়ে কী করবে?

—ওদের বুঝিয়ে বলব যে—

ধরমবীর সস্নেহে হাসল : ব্যানার্জি বাবু, দেশের কাজ যা-ই করো, তুমি এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ। পুলিসকে তুমি কী বোঝাবে? যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা তোমাকেও গ্রেপ্তার করবে। কী লাভ হবে বলতে পারো?

লাভ। সত্যিই কোনো লাভ হবে না। কিন্তু শুধু কি লাভালাভের কথাই ভাবছে অনিমেষ? আদিত্য। উজ্জ্বল নীল চোখ। একটু কুঁজো ধরণের মানুষ, অতিরিক্ত পড়াশোনা করার জন্যেই বোধ হয় ঘাড়টা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে তার। মাথার বিশৃঙ্খল ঝাঁকড়া চুলগুলো কাঁধ বেয়ে প্রায় পিঠের ওপরে নেমে এসেছে। গায়ের খদ্দরের জামাটা ছোট ছোট পিংডীর এক্সপেরিমেণ্টের একটা অপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু এই সমস্ত আপাত-বৈসাদৃশ্যের আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে শানানো তলোয়ার। সেই তলোয়াবের আঘাতেই একদিন কবি অনিমেষের রজনীগন্ধার স্বপ্ন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, সেই তলোয়ারের ঝলকেই একদিন পথ দেখতে পেয়েছিল অনিমেষ।

আজ সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আদিত্যকে খুনের অপরাধে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ অনিমেষের কিছু করবার উপায় নেই, কিছুই না।

অনিমেষ ক্ষীণস্বরে বললে, তা হলে?

ধরমবীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বললে, একটা কিছু হবেই। এই কুলি ব্যাটারা পচাইয়ের নেশায় সাহেবকে খুন করে যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে, তাতে—

ধরমবীর থেমে গেল। কুলি-লাইনের দিক থেকে প্রবল আর্তনাদ আসছে। খুব সম্ভব আসামীর হদিশ পাওয়ার জন্যে ওখানে কিছু কড়া ওষুধ প্রয়োগ করছে পুলিশ।

ধরমবীর বললে, লোকগুলোকে মারপিট করছে বোধ হয়।

অনিমেষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল : আদিত্যদাকে নয় তো?

—না অতটা নয় বোধ হয়। আচ্ছা—আমি দেখছি। তুমি চুপ করে বসে থাকো ব্যানার্জি বাবু, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। যা করবার আমরাই করব।

অনিমেষ চুপ করেই বসে রইল। কিছু ভাবতে পারছে না। চিন্তায় দুর্ভাবনায় বোঁ বোঁ করে ঘুরছে দুর্বল মস্তিষ্কটা। আদিত্যদাকে গ্রেপ্তার করেছে, অথচ তার কিছুই করবার নেই।

রবার্টসকে খুন করেছে কুলিরা। কারো মতামতের অপেক্ষা করেনি, কারো কাছ থেকে নির্দেশ নেয়নি। বাঘ শিকার-করা সাঁওতালী রক্তে যখন আগুন ধরেছে, তখন সে আদিম প্রবৃত্তিকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। প্রতিহিংসা নিয়েছে। কিন্তু এ পথ নয়। রবার্টসের মতো একজনকে হত্যা করে অত্যাচারের মূল উপড়ে ফেলা যায় না, অত্যাচারকে সুযোগ দেওয়াই হয় মাত্র। সমস্ত বিপ্লব আন্দোলনের পেছনেই এ ইতিহাস আছে। একটি হত্যার ছুতোকে অবলম্বন করে ওরা বহুকে হত্যা করবার বহু-বাঞ্ছিত অবকাশ পায়, সুবিধে পায় বিপ্লবকে সমূলে উৎপাটন করবার। কুলিরা সেই ভুলই করে বসেছে। এ ভুলের জন্যে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অনেক মূল্য দিতে হবে। আদিত্যকে দিয়েই তার সূত্রপাত।

কারা খুন করেছে? তাদের নাম অনিমেষ জানে। আদিত্যকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় তাদের নামগুলো গিয়ে পুলিশকে বলে দেওয়া। কিন্তু সে রকম একটা কথা বিকৃত-মস্তিষ্কেও কল্পনা করা চলে না।

তা হলে উপায়? আদিত্য। তাদের সংগঠনের প্রাণস্বরূপ। শুধু প্রাণই নয়, তাদের মধ্যে আদিত্য নেই একথা ভাবতে গেলেও একান্তভাবে দুর্বল আর অসহায় বলে মনে হয় নিজেদের; অথচ কিছু করতে পারছে না অনিমেষ, গিয়ে একবার দেখা করে আসবে সে উপায়ও তার নেই।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল ধরমবীর।

—ব্যানার্জি বাবু, ভারী গোলমাল শুনে এলাম।

—কী হয়েছে?

—পুলিস খবর পেয়েছে তুমিই এই সব সাঁওতালদের দিয়ে খুন করিয়েছ। আর আমার গোলায় লুকিয়ে আছ। ওরা তোমাকে ধরতে আসছে।

—বেশ, ধরুক!

—না। ধরমবীরের চোখ জ্বলে উঠল: যতক্ষণ জান আছে তা হতে দেব না।

—কী করবে?

—যা করব তা শোনো। লোক সঙ্গে দিচ্ছি, জঙ্গলের ভেতরে চলে যাও। আমার জানা আস্তানা আছে। সেখানে নিশ্চিন্ত থাকবে, কেউ টের পাবেনা।

—কিন্তু পালাব কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

—না, না, কিছুতেই তোমায় ধরা দিতে দেব না। হাতে পেলে তোমার ওপর অত্যাচার করবে ওরা। ধরমবীরের কণ্ঠস্বরে যেন আগ্নেয়গিরি আভাসিত হয়ে উঠল: আর আমার কাজ আমি করব। মহাত্মাজীর হুকুমে একদিন পথে নেমেছিলাম। আজ দেখছি মানুষ এত ছোট যে মহাত্মাজীকে বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তাদের মতো ছোট হয়ে গিয়েই আমার কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করব।

অনিমেষ সবিস্ময়ে বললে, তার মানে?

—সব কথার মানে বুঝতে চেয়ো না ব্যানার্জি বাবু। কিন্তু তুমি আব দেরী করো না, পালাও।

—তারপর?

—আমরা আছি।

অনিমেষ ধরমবীরের মুখের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল

ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নয় ধরমবীর। খুব খানিকটা কড়া মদের নেশা করলে চোখমুখের অবস্থা যে রকম হয়—ধরমবীরকে দেখলে অনেকটা তাই মনে হতে পারে। অনিমেষের ভয় করতে লাগল, শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনাটা।

—তুমি কী করতে চাও জানতে না পারলে আমি এখান থেকে যাবো না।

—কী ছেলেমানুষী করছো ব্যানার্জিবাবু—এবার যেন দস্তুরমতো একটা ধমক দিল ধরমবীর : তোমার শরীর এখনো সারেনি। তুমি রওনা হয়ে যাও—বাইরে ডুলির ব্যবস্থা হয়েছে।

অনিমেষ আর কথা বলতে পারল না : কথা বলবার কিছু তার ছিলও না।

আধঘণ্টা পরেই কাঠগোলায় এল পুলিস।

ধরমবীর যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করলে ডি-এস-পি সাহেবকে, বসালো এনে সবিনয়ে। তারপর জানতে চাইল, চা চাই হুজুরের?

ভদ্রতার বিনিময়ে দাঁত বের করে গর্জন করলেন হুজুর।

—না চা নয়, সেই ব্লাডি ব্যানার্জিকে আমার দরকার।

—কে? – নিরীহ গলায় ধরমবীর জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই?

—সেই লোকটা—দ্যাট্ রেড্ ম্যান—যার ইন্‌স্টিগেশনে রবার্টসকে খুন করা হয়েছে।

—কে সে?—তেমনি শান্ত গলায় ধরমবীর জিজ্ঞাসা করলে।

—চালাকি কোরো না।—সাহেব খিঁচিয়ে উঠল : আই নো এভ্‌রিথিং। হোয়ার ইজ্ ব্যানার্জি?

—আমি জানিনে।

—ইজ ইট?—সাহেবের চোখ চক্ চক্ করে উঠল : কিন্তু আমি নিশ্চিত খবর পেয়েছি তুমি তাকে আশ্রয় দিয়েছ।

—ভুল খবর।

—ডোণ্ট্ বী লায়িং—ডি-এস-পির স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল: তুমি একজন সম্মানিত লোক। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, অনর্থক ট্রাবল্‌স্ সৃষ্টি কোরোনা।

—আমার জবাব তোমায় জানিয়েছি।

—ওয়েল?—সাহেবের মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠতে লাগল: আমি তোমার গোলা সার্চ করব।

—বেশ, করো সার্চ।

দেড় ঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন সার্চ চলল। কিন্তু কোথাও যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন আগুন হয়ে উঠল সাহেব। সশব্দে এসে বসল বাইরের চেয়ারটায়, দেহের ভারে মড়মড়িয়ে উঠল বারান্দার প্ল্যাংকিংটাও—যেন ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে।

পাইপটায় অগ্নি-সংযোগ করে সাহেব বললে, মিস্টার সিং, আই থিঙ্ক ইউ আর এ কংগ্রেসম্যান।

—কিসে বুঝলে?—মৃদু হাস্তে জিজ্ঞাসা করলে ধরমবীর।

—দেয়ার—সাহেব আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন। দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। মহামানব এগিয়ে চলেছেন ডাণ্ডীর সত্যাগ্রহের পথে। মুখে প্রসন্ন হাসি, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত পদপাত। চারদিকে 'জয় সত্যম্' মন্ত্রের জ্যোতিঃ-রেখা যেন বিচ্ছুরিত।

—তোমার অনুমান ঠিক—খানিকটা আবিষ্টস্বরে জবাব দিলে ধরমবীর। ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে যেন তার মনে পড়ে গেছে নিজের অতীতের কথা, জেগে উঠছে ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সেই সংগ্রামী দিনগুলি।

সহেব আলগোছে পাইপের ধোঁয়া ওড়াতে লাগল আকাশে: গোটাকয়েক কথা বলতে পারি তোমাকে?

—স্বচ্ছন্দে।

—তুমি কি গান্ধীবাদে বিশ্বাস করো?

—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করবার দরকার আছে?—ধরমবীর হাসল।

—একটু আছে—সাহেব বাঁকা চোখে তাকাল: ইউ সি, তাঁর আদর্শ অনুসারেই তো তোমার চলা উচিত।

—মানে?

—সেই কথাই বলতে চাই আমি—সাহেব কাঠের প্ল্যাটফর্মে জুতোটা ঠুকতে লাগল একটু একটু করে: ইউ নো, গান্ধীজী এসব রেড আইডিয়া পছন্দ করেন না; তিনি জানেন ইণ্ডিয়া ইজ্‌ এ ফিল্ড্‌ অব্‌ পিস্‌ অ্যাণ্ড্‌—শেষ জায়গাটায় বেশ জোর একটা দমক দিলে সাহেব: অ্যাণ্ড্‌ অহিন্‌সা!

ভ্রু দুটো পরস্পর সংলগ্ন করে ধরমবীর সাহেবের মূল বক্তব্যটাকে অনুধাবন করতে প্রয়াস পেল।

সাহেব বলল, এই লোকগুলো রেভোলিউশন আনতে চাইছে—shipped from Moscow! কিন্তু তা এদের করতে দেওয়া চলবে না। যুদ্ধের পরে India must come to a setttlement with Britain—কিন্তু এই রেড-পিপ্‌ল সকলেরই শত্রু। ভারতবর্ষে এরাই মহাত্মার অহিংসাকে স্যাবোটেজ করে চলেছে।

সাহেবের মুখে গান্ধীবাদ! গরজ বড় বালাই—ধরমবীরের হাসি পেল।

—কী করতে বলছ তুমি?—সোজা কথাটাকে এবার সহজভাবেই যাচাই করে নিতে চাইল ধরমবীর।

—তুমি আমায় সাহায্য করো।

—কী ভাবে?

—গার্ডেনের এই সব রেড পিপ্‌লদের ধরিয়ে দাও। অলরেডি গুর্খাদের মধ্যে একটা আন্দোলন শুরু আমরা করে দিয়েছি, যথেষ্ট কাজও হচ্ছে তাতে।

নাউ, ইউ পিপ্‌ল—বিলিভার্‌স্‌ অব্‌ নন্‌ভায়োলেন্স, তোমাদেরও কাজ হচ্ছে এই শত্রুকে বিনাশ করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করা। বুঝতেই তো পারছ —নইলে আগুন জ্বলে যাবে সারা ভারতবর্ষে। মাথায় চড়ে বসবে অল্‌ দিজ্‌ ক্যাটস্‌ অ্যাণ্ড ডগ্‌স্‌। কাজেই তোমাদের কো-অপারেশন চাই আমাদের।

ধরমবীর চোখ তুলল। আগুনের ফুলকি সেখানে।

সাহেব আবার বললে, অবশ্য কো-অপারেশন আমরা একেবারে যে পাচ্ছিনা তা নয়। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেই সাহায্য করছেন—

—হোয়াট! —হঠাৎ যেন একটা চাবুকের ঘা পড়ল ধরমবীরের পিঠে। একথা সত্যি যে অনিমেষের সঙ্গে মতের মিল হয়না তার। এও সত্যি যে বহু প্রবল তর্ক-বিতর্কে ফলেও সে মেনে নিতে পারেনি অনিমেষের কথা, তার মন বলেছে এমন হতে পারেনা ভারতবর্ষের মাটিতে, হওয়া সম্ভবই নয়। চটাচটিও দু চারদিন হয়েছে তাদের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে! নো, দিস্‌ ইজ্‌ টু মাচ্‌।

ধরমবীরের গলার স্বরের উত্তাপটা ডি-এস্‌-পি লক্ষ্য করেও করলেন না। গালের একপাশে পাইপটাকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা সাহায্য করছেন। ইউ নো, এই লোকগুলো প্রকাশ্যে যদিও এখন আমাদের সমর্থন জানাচ্ছে, তবু এদের নজর পড়ে আছে রাশিয়ার দিকে—কপ্‌ চাচ্ছে পিপ্‌লস্‌ ওয়ার! —সাহেব বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলেন : আমরা জানি রেড পেরিল্‌ ইজ বাই ফার্‌ ওয়ার্স দ্যান্‌ ইয়েলো পেরিল। তলায় তলায় গর্ত খুঁড়ছে এরা—ব্যান্‌ তুলে নেওয়াতে যা খুশি তাই প্রচার শুরু করেছে। কিন্তু নজর ঠিক আছে আমাদের। একদিন সবগুলোকে দেব ঠাণ্ডা করে। এরা শুধু ইণ্ডিয়ার নয়, সমস্ত জগতের শত্রু—এনিমি টু ওয়ার্লড্‌ পিস্‌। তাই প্রত্যেক সেন্‌সিব্‌ল গান্ধীয়াইটের কর্তব্য এদের ধরিয়ে দেওয়া—

—চুপ করো—হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ধরমবীর: তুমি ট্রেইটার হতে বলছ আমাকে, হতে বলছ বিশ্বাসঘাতক !

সাহেব বললে, ওয়েল !

—নো, নো ! ইউ লায়ার ! —ধরমবীর গর্জন করে উঠল: মহাত্মাজী সত্যের সাধক। তাঁর কাছে যারা মন্ত্র নিয়েছে, এত নিচে তারা কোনোদিন নামতে পারে না। মতের মিল না থাকতে পারে, তাই বলে—নো, সার্টেন্‌লি ইউ আর্‌ এ লায়ার !

—ইউ টেল্‌ মি এ লায়ার দেন ?

বজ্রস্বরে ধরমবীর বললে, ইয়েস।

—তা হলে তুমি আমাদের সাহায্য করবে না ?—সাহেব উঠে দাঁড়াল, লাল মুখটা তার দীপ্ত হয়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির মতো।

—নো, ইউ জাস্ট্‌ ক্লিয়ার আউট—

—রিয়্যালি ?—সাহেব রুদ্রকণ্ঠে বললে, তা হলে তুমিও একটা ব্লাডি রেড্‌ !

—শাট্‌ আপ্‌ ! —ধরমবীর আস্তিন গোটালো।

দু পা সরে গিয়ে রিভলভারটা তুলে ধরল সাহেব: অ্যারেস্ট্‌ হিম !

দশ

মেয়েটার নাম লালী।

এরা থাকে জঙ্গলের একেবারে গভীরতম অঞ্চলে। ভয়ও নেই, আশঙ্কাও রাখেনা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে। চারদিকে নিবিড় শাল আর বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী দেওদারের বন একেবারে বাঘের রাজ্য। বনরাজের প্রবল প্রতাপের জন্যে অঞ্চলটার নাম 'মহিষ-মারা ফরেস্ট।'

বনের মধ্য দিয়ে যে কাঁচা মাটির রাস্তা—যা দিয়ে মোটর চলে, আনাগোনা করে রেঞ্জার আর ফরেস্ট্ গার্ডরা, আর যে পথের ওপর লোহার শিকলের গেট পথরোধ করে আছে বে-আইনি 'পোচারদের,' তা এখান থেকে অনেক দূরে। এরা আরো দশটা জানোয়ারের মতোই খাঁটি বন্যজীব, তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করে সভ্যতার আলো হাওয়ার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। ধরমবীরের মতো কাঠওলাদের এরা কাঠুরে, বুনো বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরী করে চা-বাগানের প্যাকিংয়ের ঝুড়ি।

এদেরই একটা ঝুপড়িতে চেতনা ফিরে পেলো অনিমেষ।

ঘরের ভেতরে শালকাঠের মাচা। ময়লা বিছানা তার ওপরে। প্রথম চৈতন্য আসতেই সে ডাকল ঃ সুমিতা?

—বাবু?

বিহ্বল চোখ মেলে তাকালো অনিমেষ। এখানে কোথাও নেই সুমিতা। থাকবার সম্ভাবনাও নেই কোনো। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার কেমন একটা অপরিচিত স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। সমস্ত চেতনাকে সজাগ করে তুলে ব্যাপারটা বুঝবার প্রয়াস পেল সে।

—বাবু ?

কে ডাকে ?

আবছায়া অন্ধকারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ওড়নার মতো করে কাপড় তুলে দেওয়া। গলায় চকচক করছে একরাশ গিল্‌টির গয়না। পাহাড়ী মেয়ে।

—তুমি কে ?

পাহাড়ী ভাষায় জবাব এল : আমি লালী ।

—লালী কে ?

মেয়েটি এবার মিষ্টি করে হেসে উঠল : লালী আবার কে ? লালী—লালী। তোমাকে তো কাঠগোলার বাবু আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তাঁর কাঠুরে কিনা।

—এ আমি কোথায় ?

—মহিষমারার জঙ্গলে।

অনিমেষের চেতনা আস্তে আস্তে কাজ করতে শুরু করেছে এখন। যা এলোমেলো আর অর্থহীন ছিল, আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিচ্ছে তাদের, সংযুক্ত করে নিচ্ছে বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলোকে। এখন যেন ভুলে-যাওয়া একটা স্বপ্নের মতো স্মৃতির মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে ফিরে আসছে কতগুলো লোকের ফিসফাস কথা, পায়ের তলায় শুকনো শালপাতার মর্মর—কারা যেন তাকে বয়ে আনছে—অতি সাবধানে, অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ভাবে।

বিচ্ছিন্নতার ফাঁকগুলি ভরে এল ক্রমে ক্রমে।

লালী বললে, এখন শরীর কেমন লাগছে বাবু ?

—ভালো।

—চা খাবে ?

—হ্যাঁ, খাব। কিন্তু—একটু চুপ করে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করলে, রংঝোরা চা বাগান কতদূর এখান থেকে ?

—প্রায় দুকোশ হবে।

—ও:।

লালী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে অনিমেষ, প্রতীক্ষা করে রইল সেইজন্যে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিৎ হয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে রইল অনিমেষ। কেমন একটা অবসাদ আর ক্লান্তি এসে যেন তার মনকে অভিভূত করে ফেলছে। কিছুই তার ভাবতে ইচ্ছে করছেনা, নিজের অতীত নয়, ভবিষ্যৎও নয়। এই বা মন্দ কী! মুহূর্তের মধ্যে যেন সব জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেছে, উত্তর মিলে গেছে সমস্ত প্রশ্নের, ঘুচে গেছে যা কিছু সংঘাত আর সংঘর্ষ। বেশ থাকা যায় এখানে। এই 'মহিষ মারার' জঙ্গলের ঘন ছায়ায়, এই ভাঙা ঝোপড়ীর আড়ালে। ব্যথা থাকেনা—বেদনাও না।

সত্যিই তো। নিজেকে যত ছোট করে আনি—সমস্যাও তো তত ছোট, তত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। নিজের দেহ, নিজের গুহা, নিজের নারী—এর চেয়ে বড় সমস্যা আর কী ছিল প্রাথমিক মানুষের? কত সুখী ছিল সে—কত তৃপ্তি। কিন্তু তারপরে এল সমাজবোধ। নিজেকে ছাড়িয়ে আরো দশজনের কথা ভাবতে শিখল সে, দেশ ছাড়িয়ে তার মন ছড়িয়ে গেল দেশান্তরে; নাড়ীর বন্ধন রচনা হল অচেনা অদেখা লক্ষকোটি মানুষের সঙ্গে—যাদের ভাষা জানা নেই, পরিচয় নেই যাদের রীতি-রুচি-চরিত্রের সঙ্গে। অথচ—

অথচ কোথায় ফ্রান্সে ধর্ম্মঘট হয়, এখানে তার ঢেউ লাগে; কোথায় 'মে'-দিবসে শ্রমিকের রক্ত ঝরে চিকাগোর মাটিতে, এখানে তার প্রতিবাদের শপথ নেয় উড়ন্ত রক্ত-পতাকা; কোথায় জ্বলে যায় অক্টোবর বিপ্লবের দাবানল—এখানে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে তার স্ফুলিঙ্গ; আর কোথাও বোমার বিদারণে ফেটে চুরমার হয়ে যায় মাটি আর এখানে চলে সাম্রাজ্যবাদীর আত্মহনন-যজ্ঞের নান্দীপাঠ।

বেশ হয় এখানে কাঠুরে হয়ে থাকতে পারলে। ঘন জঙ্গলের আড়ালে একান্তে নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকলে। কী বলা যাবে একে? পলায়ন না মুক্তি?

সুমিতাকে নিয়ে সে তো এই ভাবেই নিজেকে তলিয়ে দিতে চেয়েছিল আত্ম-সর্বস্বতায়। কিন্তু পারেনি। চারদিক ঘিরে ঘিরে গর্জন করছিল মানুষের সমুদ্র, ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্বীপের বাসা, আকস্মিক ভূমিকম্পের মতো তলিয়ে নিলে প্রবাল-ভিত্তিকে। বুঝল, সকলকে বাঁচাতে না পারলে নিজেকেও সে বাঁচাতে পারবে না—তাকে বাঁচতে দেবে না কেউ।

কিন্তু যদি তার আর সুমিতার দেখা হত এমনি কোনো অরণ্যে? যেখানে খবরের কাগজ পৌঁছয় না, সাড়া দেয় না বেতার? পথ দিয়ে যেখানে গর্জন করে বেরিয়ে যায় না ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল? কী হত সেখানে? সেখানেও কি এমনি করে তাদের নেমে পড়তে হত সংগ্রামী শপথ নিয়ে, মুঠির মধ্যে সন্ধান করতে হত কোনো হাতিয়ারের?

কে জানে!

—বাবু, চা।

লালী। আবছায়া-অন্ধকারে দেখা পাহাড়ী মেয়েটি। ভালো করে চেনা যায়না, শুধু গলায় চিকমিক করে গিল্‌টির একরাশ গয়না।

মগে করে চা এনেছে। সেই সঙ্গে এনেছে কয়েকটুকরো পাঁউরুটি।

—এখানে পাঁউরুটি পেলে কোথায়?

—কাঠগোলার বাবু পৌঁছে দিয়েছিল।

তৃপ্তিভরে রুটিতে কামড় দিলে অনিমেষ। যদিও বাসি শুকনো রুটি, যদিও চা যেমন তেতো তেম্‌নি কড়া, তবুও আশ্চর্য ভালো লাগল খেতে। যন্ত্রণাটা অল্প কিছু কমেছে, চায়ের একটা চুমুকে যেন শক্তি ফিরে এল খানিকটা। মনে পড়ল পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার কিছু খাওয়া হয়নি।

আস্তে আস্তে অনিমেষ বিছানাটার ওপর উঠে বসল।

—কাঠগোলার বাবু নিজে এসেছিল ?

—না, পাঠিয়ে দিয়েছে লোক দিয়ে—মৃদু স্বরে লালী জবাব দিলে।

—বাগানের কোনো খবর জানো ?

—ভারী গণ্ডগোল।

—কী গণ্ডগোল বলতে পারো কিছু ?

লালী মাথা নাড়ল। সে জানেনা।

নীরবে খেয়ে চলল অনিমেষ। অনেকক্ষণ খায়নি বলে রুটি চিবুতে চোয়াল যেন ধরে আসতে চাইছে তার। কিন্তু পেটে জ্বলছে খিদের তীব্র আগুন, ইন্ধন পড়ায় আরো লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠেছে সেটা।

—তোমার নাম লালী ?

—বা রে, কতবার বলতে হবে ?—লালী ফিক করে হেসে ফেলল।

—এই জঙ্গলে একা থাকো তুমি ?

—হুঁ।

—ভয় করে না ?

—নিজের ঘরে ভয় কেন করবে ?—লালী আবার হেসে ফেলল।

তা বটে। এ ওর নিজের ঘর। অনিমেষের কাছে কলকাতার মতোই এ অরণ্যের সঙ্গে ওদের স্বাভাবিক সহজসিদ্ধ আত্মীয়তা।

—কী করে চলে তোমাদের ?

লালী বললে, কাঠ কাটে জোয়ানেরা। আমরা বাগানের টুকরি বানাই। অল্প রুজি-রোজগার। কিন্তু বড় ভালো আমাদের কাঠগোলার বাবু। গান্ধী মহারাজের চেলা। আমরা দুঃখে পড়লে উপকার করেন, টাকা দেন।

সত্যি কথা। অনিমেষেরও অকুণ্ঠ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ধরমবীরের ওপরে। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী মহারাজের মতকে সে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে চিনেছে তাঁর এই চেলাটিকে। দেবতার মতো মানুষ। যেমন উদারতা, তেমনি

অসংকোচ মন। হাজার মতভেদ সত্ত্বেও কোথাও বাধে না অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে।

খানিকক্ষণ সশ্রদ্ধ নীরবতায় চুপ করে থাকবার পরে একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—তোমার এখানে আর কে থাকে লালী?

ভালো করে লালীকে দেখা গেলনা, কিন্তু শোনা গেল তার গলার স্বর যেন কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে: আর কেউ না।

—কেন, তোমার স্বামী?

তেম্‌নি ঝাপসা গলায় লালী বললে, মরে গেছে বাবু।

—মরে গেছে?—সমবেদনা ফুটে বেরুল অনিমেষের স্বরে:

অসুখ হয়েছিল?

—না বাবু, মেরে ফেলেছে তাকে।

—মেরে ফেলেছে। কে মারলে?—চমকে উঠল অনিমেষ।

—সাহেব।

—সাহেব?—অনিমেষের হাত থেকে পড়ে গেল রুটিটা।

—হাঁ, সাহেবই তো মেরে ফেললে। জঙ্গলে শিকার করতে এসেছিল, ভালু মারবে, ববা মারবে, হরিণ মারবে। আমার মরদ আসছিল কুঁজো হয়ে, কাঁধে লাকড়ির বোঝা নিয়ে। তখন সাঁঝ হয়ে আস্‌ছে। সাহেবটা খুব দারু খেয়েছিল, দূর থেকে তাকে দেখে ভাবলে ভালু। গুলি মেরে দিলে, পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে মরে গেল আমার মরদটা, রক্তে ভেসে গেল সমস্ত।

অনিমেষ শিউরে উঠল।

—তারপর?

—আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলে। বললে যা হওয়ার সে তো হয়ে গেছে, মরদটা তো আর ফিরবেনা। তুই ফের বিয়ে করিস। কিন্তু বিয়ে আমি

করতে পারিনি বাবু। আমাকে যে বড় ভালো বাসত। গুলি খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে সে ছটফট করে মরে গেল বাবু, আমি আবার বিয়ে করব কেমন করে?

আবছায়া অন্ধকারে অনিমেষ দেখল, জামার আস্তিনটা তুলে লালী তার চোখ দুটোকে মুছে ফেললে।

—তুমি থানায় গেলেনা কেন? কেন নালিশ করলেনা হাকিমের কাছে? জানো যে মানুষকে খুন করে তার ফাঁসি হয়?

—কী হবে বাবু? সাহেব মারল যে। সাহেবের তো বিচার হয়না। আর তাতেই বা কী হত? আমার মরা মরদ তো আর ফিরত না।

—তা ফিরত না। কিন্তু বদলা হত।

—বদলা?—লালীর হঠাৎ ঝকে উঠল: হাকিমের কাছে গিয়ে কি আর বদলা হয়? আমরা গরীব মানুষ। বদলা নিতে হলে নিতে হয় অমনি সাহেবকে গুলি মেরে। কিন্তু গুলি মারবে কে? কোথায় পাব আমরা বন্দুক?

অনিমেষ জবাব দিলেনা।

লালী বললে, কাঠগোলার বাবু বলে গান্ধী মহারাজের কথা। গান্ধী মহারাজ বদলা নিতে বারণ করেন। বাবু, তুমি তো কলকাতায় থাকো। তুমি গান্ধী মহারাজকে বোলো আমার কথা। বোলো, বদলা আমরা নিতে চাই না, কিন্তু আমার মরদটাকে ফিরে চাই।

লালী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনিমেষ বসে রইল স্তব্ধ স্তম্ভিত ভাবে। হয় বন্দুক চায়, নইলে ফিরে পেতে চায় স্বামীকে। স্বামীকে আর ফিরে পাওয়া যাবেনা একথা লালীও জানে, অনিমেষও জানে। কিন্তু বন্দুক?

হয়তো চা-বাগান থেকে আরম্ভ করে শালবনের কাঠুরেরা অবধি সকলে হাত বাড়িয়ে আছে সেই জন্যেই। সে বন্দুক কি আসবে তাদের হাতে? অথবা

গান্ধী মহারাজ দিতে পারবেন তাদের এমন কোন অশোকমন্ত্র যা তাদের এনে দেবে নতুন সত্য, নতুন প্রাপ্তি ?

তবে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে, হয়ে গেছে নগ্ন আর উজ্জ্বল। সুমিতা আর সে এই জঙ্গলে এসে ঘর বাঁধলেও আত্মরক্ষা করতে পারত না। সাহেবের গুলি এসে বিঁধত তারও বুকে, তারও রক্ত ছড়িয়ে পড়ত শালবনের শুকনো ঝরে-যাওয়া পাতায় পাতায়।

কবি ইন্দুর লাইন মনে পড়ছে :

গর্জন করো হে আফ্রিকা,
ফিলিপাইন, ছাড়ো হুঙ্কার !
শোনো নাকি কানে স্পর্ধিত পদ-পাতে
মানুষ-শিকারী ফেরে ?
উদ্যত করো সিংহের শাণিত থাবা
উদ্যত রাখো বিষাক্ত ব্যুমেরাং !
এলো হিসেবের দিন।
কতকাল আর লিখবে খরচ ব্যর্থ চোখের জলে
রক্ত-লেখায় জমার অঙ্ক শুরু !

* * * *

সেই রাত্রে ঝোপড়ীর ভেতরে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসতে হল অনিমেষকে। উঠে বসতে হল অরণ্য-কাঁপানো কোলাহলে।

যেন প্রলয় শুরু হয়ে গেছে বাইরে। চারদিকে অর্থহীন অমানুষিক শব্দের সমারোহ। ঝমর ঝম্ ঝমর ঝম্ শব্দে বাজছে কতগুলো বিকট বাজনা। প্রাণপণ চিৎকার উঠছে মানুষের।

হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঘরে ঢুকল লালী। মশালের সেই আলোয় লালীর একটা অদ্ভুত মুখ দেখতে পেলো অনিমেষ। যেন আগুনের

উত্তাপে টকটকে রাঙা হয়ে ওঠা কোনো ধাতব-মূর্তি। চোখমুখ তার ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে লালী, ব্যাপার কী?

—ভয় নেই বাবু—লালী অভয় দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ভয়ে তখন তারই গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—কিন্তু ও কিসের আওয়াজ? কী হয়েছে?

—কিছু না, মাত্‌লা হাতী।

—মাত্‌লা হাতী!

—হাঁ, মাত্‌লা হাতী। প্রায়ই ক্ষেপে যায় এই সময়ে। সামনে যা পায় ভেঙে চুরমার করে দেয়। দেয় সব তচনচ করে ঘর বাড়ি, ক্ষেত কিছু রাখেনা।

—সর্বনাশ!

—ভয় নেই বাবু, পালিয়েছে। আগুন দেখে আর বাজনার শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। নইলে সব শেষ করে দিত এতক্ষণে। গতবারে তিনটে মানুষকে মেরে ফেলেছিল।

—মেরে ফেলেছিল!

—হ্যাঁ, একেবারে। এমন করে চেপ্‌টে দিয়েছিল যে মানুষ বলে চেনাই যায়নি। থেত্‌লে থেত্‌লে মিশিয়ে দিয়েছিল মাটিতে।

অনিমেষ নিস্তব্ধ।

—তবে আজ পালিয়েছে। অনেক দূরে পালিয়ে গেছে। আর কোনো ভয় নেই, ঘুমোও বাবু।

মশাল হাতে করে চলে গেল লালী।

কিন্তু আজ আর ঘুমোতে পারবেনা অনিমেষ, কেমন করে ঘুমুবে সে? অরণ্য—অরণ্যের আশ্রয়। কী ভ্রান্তি কী মূঢ়তা। এ যে আরো ভয়ঙ্কর,

আরো নিষ্ঠুর শত্রু! এই শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তো মানুষের সমাজ রচনা, মানুষের নাগরিক জীবনের সূত্রপাত, ব্যক্তি-মানুষের দূরে-দূরান্তে দেশে-দেশান্তে আত্মপ্রসার। কী প্রলাপ ভাবছিল সে।

এখানে আজ আর বানপ্রস্থ নয়, কাজ—আরো বেশি কাজ। মানুষের শত্রুতা তো আছেই, অরণ্যও আছে রাক্ষসীর মতো জিহ্বা মেলে, অসংখ্য ফাঁদ পেতে রেখেছে তার কালো আবরণের গভীরে গভীরে। আরো বেশি কাজ এখানে। এই অন্ধকারের মধ্যে আলো আনতে হবে—বয়ে আনতে হবে সূর্য-সারথির সংকেত।

মাত্‌লা হাতীকে কি বশ করতে জানে ধরমবীর? কে বলবে। কিন্তু এখানে আর নয়। পালিয়ে থাকবার সময় নেই আর—ভূমিকম্পে ভেঙে ভেঙে প্রবাল-বলয় মিলিয়ে যাচ্ছে ফেনিল সাগরের তরঙ্গে!

এগারো

শীলার মৃত্যুটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না সুমিতা।

শীলা মরে গেছে। কিন্তু মরে গেছে বললে কথাটা ঠিক হল না, শশাঙ্ক হত্যা করেছে তাকে। শশাঙ্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোক শশাঙ্ক। সমাজ সংস্কার করবার জন্যে শীলাকে বিয়ে করেছিল, চেয়েছিল একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। কিন্তু তার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর একথা কল্পনা করেছিল কে!

মনে আছে শীলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন : যা করতে যাচ্ছ তার ভবিষ্যৎ ভেবেছ কি? এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল শীলা। স্বল্পভাবী মানুষ, কোনোদিন বেশি কথা বলেনি, কোনোদিন সহজে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করতে চায়নি। কিন্তু সেদিন কথা বলেছিল। বলেছিল, আমি ওঁকে বিশ্বাস করি সুমিতাদি—উনি আমাকে কখনো ঠকাবেন না।

বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে শশাঙ্ক। কিন্তু কাকে দোষ দেবে সুমিতা? এই বিশ্বাসের ওপরেই তো অনাদি অনন্তকাল থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে প্রেম। বারে বারে প্রেম আঘাত খেয়েছে, বারে বারে প্রেম মিথ্যার সংঘাতে রঙীন কাচপাত্রের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ঝিলের জল রাঙা হয়ে গেছে বনহংসীর বাণবিদ্ধ বুকের মতো। তবু প্রেম মৃত্যুহীন। শশাঙ্করা শীলাদের চিরকাল ঠকিয়ে আসছে, চিরদিন ঠকাবে। তবুও শীলারা শশাঙ্কদের ভালোবাসবে—আফিং খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—

এক অনিমেষ কি এই সত্যটাকে বুঝতে পেরেছিল? কী জানি।

কিন্তু অনিমেষের কথা মনে পড়তেই সুমিতার মনটা ভয়ানকভাবে

নাড়া খেয়ে উঠল। আজ পাঁচ দিন আগে চা বাগান থেকে অস্বস্তিকর সেই খবরটা এসেছে, পাঁচ দিন আগে রওনা হয়ে গেছে আদিত্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—এর ভেতরে কারো কোনো খবর নেই। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে। এক লাইন পোস্টকার্ড লিখে একটা খবর দেওয়াও কি অসম্ভব ছিল?

মরুক গে। এখানে তার অনেক কাজ। এখানে তার সংসার। এই বিরাট সংসারের ভার আদিত্য তাকে দিয়ে গেছে। তার কর্তব্য সে করে যাবে—তার বেশি ভাববার উপায়ও নেই তার, সময়ও নেই।

—সুমিতাদি?

—কে, ইন্দু?

—রমলাদির কী হল বলো দেখি।

—রমলা? কেন—কী হয়েছে?

—কাল সকালে বেরিয়ে গেছে—এখনো ফেরেনি!

—সেকি!—ভয়ে সুমিতা পাণ্ডুর হয়ে উঠল: গেল কোথায়?

—সে আমরা কেমন করে জানব? এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে হয়তো—

—আত্মীয়-স্বজন!—সুমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করলে: আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে বলে তো জানি না। হস্টেলে থেকে পড়ত, তারপর এখানে—তবে—

একটা কথা মনে পড়তেই চমক ভাঙল। বাসুদেব। এর মধ্যে বাসুদেবের কোনো হাত নেই তো? কিন্তু তাও কি সম্ভব? এমনভাবে না বলে কি কখনো চলে যেতে পারে রমলা? না—অতটা দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত মেয়ে সে নয়।

সুমিতা সত্রাসে বললে, থানাগুলোতে খবর নাও। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করো। যদি কোনোরকম অ্যাক্সিডেন্টে ঘটে থাকে—

ইন্দু বললে, তাই যাচ্ছি—

সুমিতা এল রমলার ঘরে। ছোট বিছানাটা যত্ন করে গুটোনো—ডালা-খোলা অ্যাটাচিটা তার পাশেই পড়ে আছে। এটা ঠিক যে রমলা ইচ্ছে করে চলে যায়নি। এমনকি যে বইখানা পেনসিলে দাগ দিয়ে দিয়ে সে পড়ছিল, তার পাতাটাও যেমনি করে ভাঁজ করা আছে। একপাশে ময়লা শাড়ী, জামাগুলো স্তূপাকার। শুধু নেই তার ব্যাগ আর স্লিপারটা।

দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ মুখে সুমিতা খানিক্ষণ রমলার বিছানার ওপরে চুপ করে বসে রইল। কী হল মেয়েটার? যুদ্ধ—ব্ল্যাক-আউট। বিশৃঙ্খল কলকাতা, কোনো গুণ্ডা বদমায়েসের হাতেই গিয়ে পড়ল না তো শেষ পর্যন্ত? ভাবতেও আতঙ্কে যেন দম আটকে এল তার।

তবু বৃথা আশায় চারদিকে একবার খুঁজলে সুমিতা। যদি একখানি চিঠি পাওয়া যায়—যদি কোনো হদিস মেলে—

কিন্তু বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না সুমিতাকেও। একটু পরেই এল ডাক-পিয়ন আর তার সঙ্গে এল রমলার চিঠি।

রমলা লিখেছে :

সুমিতাদি, অমি পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি যে এত দুর্বল তা জানতাম না। বাসুদেব আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। তার মৃত্যু আমি সহ্য করতে পারব না। জানি, কতবড় অন্যায় আমি করছি। কিন্তু আজ যদি বাসুদেব আত্মহত্যা করে—তা হলে সেটাও কি অন্যায় হবে না? কোনটা বড় অন্যায়, আর কোনটা ছোট, তা বিচার করবার শক্তি আমার নেই—এ ত্রুটি আমি স্বীকার করি।

তোমার সঙ্গে দেখা করবার সাহস আমার নেই। জীবনে কখনো আর হয়তো দেখা হবে না। প্রণাম নিয়ো।—রমলা।

চিঠিটা হাতে করে সুমিতা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ইতিহাসের

পুনরাবৃত্তি এমনি করেই ঘটে নাকি? শীলা যে ভাবে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে—রমলাকেও কি তাই করতে হবে?

দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল হাসপাতালের ছবি। লোহার খাটে শুয়ে আছে শীলা। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। গালের এক পাশে কয়েক ফোঁটা কালো রক্ত জমে রয়েছে। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো রমলার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুমিতার যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। শীলা, না রমলা?

কিন্তু নিজেকে সংযত করলে সুমিতা। সবাই তো শশাঙ্ক নয়। পৃথিবীতে সব প্রেম এমনি করে ব্যর্থ হয় না, যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সব প্রেমের মর্মগত নগ্ন স্বার্থপরতাই যে এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বলতে পারে?

নিজের বাসর-ঘরে আগুন জ্বলেছে সুমিতার। রুদ্র-দেবতার আহ্বানে বেরিয়ে চলে গেছে অনিমেষ। তাই কি পৃথিবীর যত প্রেম তাদের সকলের সম্পর্কে একটা অবচেতন ঈর্ষ্যা জেগেছে সুমিতার মনে? শীলার মৃত্যুতে কি এক ধরণের আনন্দ পেয়েছে—এক ধরণের তৃপ্তি পেয়েছে সুমিতা—নিজেকে সান্ত্বনা দেবার, আশ্বাস দেবার একটা আশ্রয় আর অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে সে?

কথাটা ভাবতেও সুমিতা শিউরে উঠল। মনের মধ্যে অনুভব করল যেন একটা প্রচ্ছন্ন সরীসৃপের বিষাক্ত নিশ্বাস। হঠাৎ নিজের মধ্যে এ কী বিচিত্র ভয়াবহ একটা সত্যকে আবিষ্কার করে বসল সুমিতা।

রমলার চিঠিটার দিকে আর একবার তাকাল সে। না—না, সুখী হবে রমলা, জয়ী হবে। বাসুদেবের প্রেমে হয়তো খাদ নেই, হয়তো রমলাকে না পেলে সে সত্যিই বাঁচাব না। ঘর যার ভেঙেছে, ভাঙুক। যে ঘর বেঁধেছে তার স্বপ্ন যেন মিথ্যে না হয়!

একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো বাইরে থেকে এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়া এসে সুমিতার চুলে-চোখে আছড়ে পড়ল।

খাওয়ার ঘরে তখন তর্কের ঝড় শুরু হয়েছে। রমলার তিরোধানের খবর সকলে রাখে না, যারা জানে তারাও চুপ করে আছে। অতএব তর্ক চলছে তাদের চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়ে।

—তা হলে শনিবার থেকে এশিয়া আয়রণে স্ট্রাইক?

—কিন্তু এ সময়ে তো স্ট্রাইকের কথা ছিল না। এখন প্রোডাক্‌শন বাড়াতে হবে, লড়তে হবে ফ্যাসিস্ট্‌ অ্যাগ্রেশনের সঙ্গে—

—সেজন্যে অনেক সয়েছি আমরা। অনেকখানি ত্যাগ করেছি। কিন্তু এরা যা করে তুলেছে তা সহ্য করা অসম্ভব। এখানে এখন ইমিডিয়েট্‌ বাঁচা মরাটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছ যে!

—প্রিন্সিপ্‌লের কি ক্ষতি হবেনা?

—না। বড় আদর্শের জন্যে খানিকক্ষণ পর্যন্ত প্যাক্ট্‌ করা চলে, কিন্তু প্যাসিফিজম্‌কে বেশি বাড়তে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সকলেই এই কথা বলছেন।

—একেবারে স্ট্রাইক্‌ পর্যন্ত যেতে হবে?

—উপায় নেই।

—কিন্তু ওদের ইউনিয়ানের অবস্থা কি যথেষ্ট ভালো? শুনেছি রি-অ্যাক-শনারী দলগুলো এর মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

—হাঁ—শেষ পর্যন্ত যদি কল্‌ অফ্‌ করতে হয়—

—কক্ষণো না। আজকে লেবারের আর সে অবস্থা নেই। নিজেদের দাবী-দাওয়া ওরা বুঝে নিয়েছে। ওরা জানে হাজার অসুবিধে হলেও পিছিয়ে

যাওয়া চলবে না। একবার পিছিয়ে গেলে আবার এগোতে পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে।

—সে বেশ কথা। তার আগে স্ট্রেংথ একবার বোঝা দরকার তো। শেষ পর্যন্ত যদি—

—দ্যাখো—একটা জিনিস তোমরা বুঝতে পারছ না। মানলাম, ওরা এখনো যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। এটাও সত্যি যে কোনো কাজেই তোমরা সকলের সমর্থন সঙ্গে সঙ্গে পাবে না। কিন্তু একবার কাজটা শুরু হয়ে গেলে ঝোঁকের ওপরে সবাই এগিয়ে আসে—তখন আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

—হাঁ—বিশেষ করে ওদের রক্তে বিপ্লবের বীজ। সব সময়ে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। শুধু সুযোগ বুঝে ওদের জাগিয়ে দিতে হয়।

—কিন্তু কাজ বন্ধ হলে মজুরীও বন্ধ হবে। তখন খাবে কী?

—সে ব্যবস্থা যদি না করতে পারো তা হলে এতদিন ওয়ার্ক করছ কী? সেইখানেই তো ওদের ইউনিয়ানের শক্তি পরীক্ষা হবে। তা ছাড়া কালেক্‌শন করতে হবে—যেমন করেই হোক স্ট্রাইককে বাঁচিয়ে রাখা চাই।

—মালিক এবার খুব স্টার্ণ অ্যাটিচুড নেবে বোধ হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক।

—দরকার হলে গুলি চালাতে পারে।

—সে তো আরো ভালো। যত বেশি গুলি চলবে তত বেশি করে শক্তি বাড়বে আমাদের। গুলির ভয়ে কোনো দেশে বিপ্লব হয়েছে কি কখনো? চিকাগোর পথ একদিন রক্তে লাল হয়ে গেছে, একদিন প্যারীর পথে হাজার মজুর রক্ত দিয়েছে—সোভিয়েটের তো কথাই নেই। কিন্তু ফল হয়েছে কী? কে জিতেছে?

—সে কথা সত্যি। তবে আমাদের অর্গানাইজেশন—

—এখনো অত শক্ত হয়ে উঠেনি। হয়তো পিছিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু আজ পিছোলেও কাল আমরা এগোবই। এক আঘাতেই কোনো বিপ্লব কখনো সার্থক হয়নি। নাইন্‌টিন্ ফাইভের পরে এসেছে নাইন্‌টিন্ সেভেন্‌টিন। তোমারা কি একেবারই ক্যাপিটালিজ্‌মকে শেষ করে দিতে চাও নাকি? দিস্ ইজ ওন্‌লি দি বিগিনিং অব্ দি এণ্ড।

ঘরে ঢুকল সুমিতা।

—ব্যাপার কী, তোমরা যে ঘর-বাড়ি একেবারে ফাটিয়ে দিচ্ছ।

—সুমিতাদি শনিবারে এশিয়াটিক আয়রণে স্ট্রাইক।

সুমিতা একটা আসন টেনে নিয়ে বসল: মালিকের সঙ্গে রফা হল না?

—না।

—কেন, একটা সেট্‌লমেন্টের কথা তো হচ্ছিল। কী দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত?

—যা দাঁড়ায়। স্রেফ ভাঁওতা।

—আর উপায় নেই তবে?

—নাঃ। ওরা আপোষের কোনো কথাই শুনতে রাজী নয়। সুতরাং ওদের একবার নিজেদের শক্তিটাই ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—ফ্যাক্টরীতে এখন ওদের কাজের চাপ। ওয়ার এমার্জেন্সী। ক্ষেপে গিয়ে রিপ্রেশন চালাতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু সুমিতাদি কতদিন গুলি চালাবে ওরা? ওদের গুলি একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ মেরে কোনোদিন ওরা শেষ করতে পারবে না।

হঠাৎ বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিলে সুমিতা। কেমন যেন জোর ফিরে পেয়েছে নিজের পায়ে। রমলা চলে গেছে, কিন্তু তার ভেতরে কোনো

সংকেত নেই পরাজয়ের, কোনো ইঙ্গিত নেই ব্যর্থতায়। আরো অনেকে আছে—এই ছেলেরা আছে, আছে এই মেয়েরা। শীলার ভাঙা সংসার নয়, রমলার ক্লেদাক্ত গতানুগতিক সংসার নয়—এদের নিয়েই সে গড়ে তুলবে সমস্ত মানুষের সংসার—ভাবী ভারতের যৌথ-পরিবার।

* * * * *

রাত হয়ে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন মণিকাদি। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল।

—এত রাত্রে আবার কে জ্বালাতন করতে এল?

বিরক্ত মুখে গজ গজ করতে করতে উঠে গিয়ে মণিকা দরজা খুলে দিলে। তারপর আতঙ্কে তিন পা পেছিয়ে এল।

—এ কে?

—আমি অনিমেষ।

—এ কি চেহারা তোমার?

—পরে বলব। এখন এক কাপ চা খাওয়ান তো মণিকাদি।

বারো

টেবিলের এক পাশে একটা সবুব আলো জলছিল। আলোটা ক্ষীণ—ঘরখানাকে উদ্ভাসিত করে তোলেনি, বরং একটা বিষণ্ণ ছায়ায় ম্লান করে রেখেছে। গোটা কয়েক ধূপকাঠি জলছে টিপয়ের ওপরে—বন্ধ ঘরের ভেতর রুদ্ধ সুগন্ধি আবর্তিত হচ্ছে। শেল্ফের ওপরে টিক টিক করছে ঘড়িটা। দেওয়ালে মণিকাদির একখানা ছবি—প্রথম কৈশোরে যে সময় মানুষ নিজেকে ভালোবাসতে শেখে বোধ হয় সেই সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। তারপর কৈশোরের আত্মপ্রেমকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে বহু ঝড়, বহু ভূমিকম্প, বহু বিপর্যয়। শুধু সেদিনের ছায়ামূর্তি নিয়ে দেওয়ালের বুকে মণিকাদির ফোটোটা জেগে রয়েছে। বয়েসকালে মণিকাদির চেহারা নেহাৎ মন্দ ছিল না।

ওই ফোটোটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল অনিমেষ আর পায়ের কাছে তেমনি নীরবে বসে ছিল সুমিতা। একটা পুরু কাশ্মীরী র‍্যাগ অনিমেষের গলা পর্যন্ত টানা, পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর মতো ম্লানিমা। সুমিতা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকেই। বাইরে বর্ষণ-মন্দ্রিত শীতের রাত্রি যেন স্বপ্নময়ী হয়ে উঠেছে। কাচের জানালায় ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, শীতার্ত অন্ধকার কলকাতা মৃত্যুভয়ে যেন অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে।

অনিমেষ আস্তে আস্তে বললে, পালিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি।

সুমিতা শুনে যেতে লাগল, জবাব দিলে না।

অনিমেষ আবার বললে, ওতে করে নিজেদের অপরাধটাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল। কাজটা ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে।

সুমিতার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনাচ্ছিল : কিন্তু রবার্টস তোমাকে মারবার পরে কুলিরা ধরমবীরের ওখানে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল এ খবর তো কেউ জানত না।

—বাগানের ডাক্তার খোঁজ পেয়েছিল। লোকটা সাহেবের স্পাই, ওর নজর কেউ এড়াতে পারে না। এ সব গণ্ডগোল ওরই জন্যে।

—তা হলে ?

—তাই ভাবছি। ওরা যা বোঝবার সোজা বুঝে নিয়েছে। রবার্টস আমাকে মারবার পরেই আমি কুলিদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি, কুলিরা রবার্টসকে খুন করেছে। সুতরাং আমরা সবাই খুনী, আদিত্যদাও।

—কিন্তু সত্যিই তো তুমি জানতে না।

—না, আমরা কেউ কিছুই জানতাম না। কুলিদের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওরা কারো কথা শোনবার অপেক্ষা রাখেনি। নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যেই ওরা অপরাধীর বিচার করেছে।

—কিন্তু এর ফল যে ভয়ানক হল।

—হল বইকি। এ পথ আমাদের নয়। একজন রবার্টস্‌কে খুন করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবী জুড়ে রক্তবীজ রবার্টসদের ঝাড় শুদ্ধ, উপড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু ওরা ভুল করল, ভয়ঙ্কর ভুল করল। এক পা এগোতে গিয়ে আমরা তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

—তাহলে ?

অনিমেষ ক্লান্তভাবে হাসল : আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। অনেক অপচয়ের ভেতর দিয়ে করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সুমিতা নীরবে চিন্তা করতে লাগল।

অনিমেষ বলে চলল, কিন্তু আমাদের দমে গেলে চলবে না সুমি। বিপ্লবের ধর্মই যে এই। শক্তি আমরা যত বেশি সঞ্চয় করব, স্থানে অস্থানে সে

শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেই। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটবে, আমরাও রেহাই পাব না। তারপর যেদিন শেষ বিপ্লব আসবে—সেদিন আমরা অনেকেই চূর্ণ হয়ে যাব বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তবীজেরাও একেবারে নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে। এ তারই ভূমিকা।

—কিন্তু আদিত্যদা ?

—বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না। অনিমেষ ব্যানার্জিকে খুঁজতে যাওয়ার সঙ্গে বাগানের ম্যানেজার খুন হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু দুর্ভোগ বইতেই হবে।

—আর তোমার ?

—এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।—অনিমেষ বললে, শোনো সুমি, জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলাম। পেয়েছিলাম লালীর আশ্রয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল, এই জঙ্গলের ভেতরে কত সুখে আছে ওরা। কিন্তু দেখলাম, ভুল। সেখানেও হাত বাড়িয়েছে অন্যায়—সেখানেও গিয়ে পৌঁছেছে মানুষের অপরাধ। তা ছাড়া প্রকৃতিও সমান নিষ্ঠুর। আজ সকলকে বাঁচাতে হলে লড়তে হবে মানুষের সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গেও।

কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অনিমেষ, বড় একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। আবার সমস্ত ঘরটায় ঘনিয়ে এল সঙ্কেতময় একটা নিস্তব্ধতা। ধূপদানীতে ধূপকাঠিগুলো পুড়ে পুড়ে ঘরময় গন্ধের ইন্দ্রজাল বিকীর্ণ করতে লাগল। বাইরে বৃষ্টি চলেছে সমানে—যেন আকাশজোড়া একটা তার-যন্ত্রে মল্লারের মূর্ছনা অনুরণিত হচ্ছে। উত্তুরে বাতাসে যেন পূবালি হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে—যুদ্ধ-শঙ্কিত বেদনার্ত কলকাতার চোখের জল আকাশ থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে। কাচের জানলায় তেমনি বিদ্যুতের চমক।

অনিমেষ ভাবছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী : দরকার হলে এক পা

এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাও। সত্যি কথা—কোনো ভুল নেই, কোনো সংশয় নেই। বিপ্লব কখনো সোজা রাস্তায় তীরের মতো উড়ে চলে না। তার লক্ষ্য নিশ্চিত, কিন্তু গতিপথ সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা, কুটিল। 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।' কিন্তু প্রতীক্ষা করা যায় না—অপেক্ষা করা যায় না। কুলিরা হয়তো ভুল করেছে—কিন্তু একেবারেই কি ভুল করেছে? অপমানে যখন হাড়গুলো পর্যন্ত ইলেকট্রিক আগুনে জ্বলে যাওয়ার মতো পুড়ে যায়—যখন প্রতিটি মুখের গ্রাস লজ্জা আর ক্ষোভের অশ্রুতে নোনা বলে মনে হয়—যখন সহিষ্ণুতার পাত্র মানুষের নিজের রক্তেই পূর্ণ হয়ে ওঠে—তখন কজনে বিচার করে চলতে পারে? অপেক্ষা করতে পারে কয়জন? ঠিক যে কারণে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের হাতে একদিন রিভলবার গর্জন করে উঠেছিল, কালাপানির পারে আর ফাঁসির মঞ্চে তারা জীবনের জয়গান গাইবার শক্তি অর্জন করেছিল, আজ সেই কারণেই কুলিদের 'কাঁড়' এসে রবার্টসের ফুসফুস ফুটো করে ফেলেছে। কাকে দোষ দেবে অনিমেষ? পিছিয়ে যেতে হল—কোনো ভুল নেই। কিন্তু পিছোতে পিছোতে এমন এক জায়গায় মানুষ এসে দাঁড়াবে—যেখান থেকে আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। তারপরে 'আগে কদম'! আঘাত করো—ভাঙো—মিথ্যার আর শোষণের যে দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাক্ষসের মতো নরবলি নিচ্ছে, তাকে সেখান থেকে উপড়ে এনে বিসর্জন দাও অতলান্ত সমুদ্রের জলে। সেই সিংহাসনে বসাও নতুন যুগের দেবতাকে, মানুষকে, সমাজকে। শেষ সংগ্রামে সেইদিন জয় হবে।

লালীর মুখ মনে পড়ে। তার স্বামীকে শিকারের উৎসাহে গুলি করে মেরেছিল সাহেব। মনে পড়ে নিশীথ রাত্রের দুঃস্বপ্নের মতো সেই সর্বনাশা মাত্‌লা হাতীটার আবির্ভাবের কথা। মানুষকে বাঁচাতে হবে। শুধু ধনবাদী তার শত্রু নয়, তার শত্রু প্রকৃতিও। তাই একদিকে ধ্বংস, আর

একদিকে সংগঠন। একদিকে তাকে বাঁচতে হবে, অন্যদিকে তার জন্যে গড়ে দিতে হবে নতুন মানুষের সমাজ। প্রকৃতির অন্ধ বিদ্বেষের কাছে তাকে ছেড়ে দিলে চলবেনা।

গভীর গলায় অনিমেষ বললে, সুমি, আমরা জিতবই। তুমি ভেবো না।

সুমিতা হঠাৎ মৃদুরেখায় হেসে ফেলল: না, আমি ভাবব না।

ঘরে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

না, সুমিতা ভাববে না সত্যিই তো তার ভাববার কী আছে। সে তো সেনাপতি নয়, সৈনিক। তাকে যে পথে চলবার নির্দেশ দেওয়া হবে সেই তার একমাত্র গন্তব্য। পথের লক্ষ্য সে জানে, কিন্তু পথ জানে না। সে জানে অনিমেষ, আদিত্য—আর পৃথিবীর বিপ্লবীরা—দেশ-দেশান্তের, যুগ-যুগান্তের সূর্য-মন্ত্রের সাধকেরা।

তবু পথ চলতে বাধা আসে। বাধা দেয় রমলা, দেয় শীলা। শীলা মরে গেছে, রমলা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বাসুদেবকে। একজন পথ খুঁজে পেল অপমৃত্যুর মধ্যে, আর একজন পথ খুঁজে নিলে দৈনন্দিন জীবনের মৃত্যুর মতো সংকীর্ণতার অন্তরালে। সুমিতা জানে ওরা দুজনেই পথভ্রষ্ট, রমলার পরিপূরক শীলা। তবুও পতঙ্গের মতো উড়ে যেতে চায় পুড়ে মরতে চায়। আজও সুমিতা নিজেকে জয় করতে পারল না।

আজকের এই রাত্রি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন ঘরে সে আর অনিমেষ। সুমিতার মনে হল এ তাদের বাসর-রাত্রি। তিন বছর আগে, তিন বছর আগে এমন একটি নির্জন ঘরে বর্ষাতরঙ্গিত রাত্রিতে যদি তার সঙ্গে অনিমেষের দেখা হত, তাহলে কী হত?

কী হত? ভাবতেও সমস্ত শরীর একটা নিষিদ্ধ আনন্দের নেশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু তিন বছর আগের রাত্রি আর নেই। এ তাদের বাসর বটে, কিন্তু লোহার বাসর। বাইরে বৃষ্টিতে স্বপ্নের মূর্ছনা

তার কানে এসে বাজছে না, যেন ক্রূর-কুটিল একটা চক্রান্তের আভাস সে পাচ্ছে। উত্তর বাতাসে পূবালির আমেজ নেই, মনে হচ্ছে লোহার বাসরের চারপাশে ঘিরে ঘিরে কালী-নাগিনীরা গর্জে বেড়াচ্ছে, একটা ছিদ্রপথ পেলেই সেখান দিয়ে এসে লখীন্দরকে দংশন করবে।

এ কী করল সুমিতা। এ কোন বাহুর প্রেমে জড়িয়ে পড়ল। আজ মনে হচ্ছে এ পথ তার ছিল না। অতি কঠোর, অতি নিষ্ঠুর। সহজ স্বাভাবিক প্রেম—রমলার মতো ভালোবাসাকে জীবনে কেন মেনে নিতে পারল না? পুড়ে মরত? পুড়ে মরাই যদি পতঙ্গের ধর্ম হয় তবে আলোক-তীর্থের পথে তার এই অভিযান কেন? তার পাখা ছিঁড়ে পড়ছে—সে আর সহ্য করতে পারছে না।

অনিমেষ ডাকলে, সুমি?

সুমিতা চমকে উঠল। বহুদিন পরে এমন কোমল গলায় এত মিষ্টি করে অনিমেষ তাকে ডেকেছে। রক্ত যেন ঝন ঝন করে উঠল। একটা রাত্রে ব্যতিক্রম হলে ক্ষতি কী। বিপ্লবীর জীবন কি এমনই শূন্যচারী যে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে সে মাটির কাছে নেমে আসতে পারে না? অথবা সে জীবন সমগ্রব্যাপী মহাজীবনের সাধনা করে বলে প্রতি দিনের ছোট বড় কামনার একটি ঝরা পাঁপড়িও কুড়িয়ে নিতে রাজী নয়?

অনিমেষ আবার ডাকলে, সুমি?

সুমিতা কথা বললে না, শুধু কথার আলোয় উজ্জ্বল দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি অনিমেষের চোখের ওপরে ফেলল। ঘরে সবুজ আলোটার দীপ্তি তার দৃষ্টিকে আরো ঘন, আরো নিবিড় করে তুলল।

অনিমেষ বললে, কাছে এসো।

সুমিতার হৃৎপিণ্ড দুটো প্রাণপণে শব্দ করতে লাগল, মনে হল কী একটা অসহ্য উদ্দাম আবেগে যেন তারা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়বে।

আজ তার প্রথম মিলন রাত্রি এল নাকি? বিপ্লবী যাত্রী সূর্যোদয়ের দিগন্তে যাত্রা করবার পথে একটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাকে কি উপহার দিয়ে গেল?

নিরুত্তরে সুমিতা এগিয়ে এল, বসল অনিমেষের পাশে।

আজ তিন বছর পরে অনিমেষ সুমিতার একখানা হাত টেনে নিলে বুকের ওপরে। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে অনিমেষের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগল—মনের মধ্যেও কোথায় যেন জমাট তুষারকণা তরল হতে শুরু করেছে সুমিতার।

অনিমেষ বললে, তোমাব খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

চাপা গলায় ফিস ফিস করে জবাব দিলে সুমিতা: না, কষ্ট আর কী।

—জানি, তোমার এখনো কিছু কিছু কষ্ট হয়—ঘরের জন্যে মন টানে। কী হতে পারতে, অথচ কী হয়ে গেলে।

সুমিতা চোখ বুজে অনিমেষের বিচিত্র স্পর্শানুভূতিটা যেন নিজের চেতনার মধ্যে সঞ্চার করে নেবার চেষ্টা করছিল। তেমনি চাপা গলায় জবাব দিলে, না।

অনিমেষ হাসল: তার চেয়ে সেই রমেশ চৌধুরীকে অনুগ্রহ করলে আজ কোনো ঝঞ্ঝাট তোমার থাকত না। বড় লোকের ছেলে—বহুদিন মোটর নিয়ে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরেছিল, অনেক সাধনা করেছিল। চৌধুরী-গিন্নী হলে আজ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতে।

সুমিতার চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আসছিল। কথা বলবার কিছু নেই—বলবার প্রেরণাও নেই। যুগযুগান্তরের ক্লান্তি যেন আজ তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

অনিমেষ বললে, সুমি, অনেকের ঘর বাঁধবার জন্যে আমাদের ঘরটাকে নেহাত বাজে খরচ করতে হল। কিন্তু কে জানে—হয়তো সুযোগ আমাদেরও আসবে। আমরা সন্ন্যাসী নই—কিন্তু যুদ্ধ যখন সুরু হয়েছে, তখন রাইফেল ছাড়া আর কী ভাবতে পারি, বলো?

সুমিতা কিছুই বললে না। শুধু অনিমেষের বুকের ওপর নিজের মাথাটাকে এলিয়ে দিলে—বহুদিনের বহু অনিদ্রা সুযোগ পেয়ে তার ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অসুস্থতা আর ক্লান্তি অনিমেষকেও কি দুর্বল করে ফেলেছে? মুহূর্তের জন্য সমস্ত মনটা তার বিদ্রোহ করে উঠল। কিন্তু সবুজ ল্যাম্পের স্বপ্নচ্ছায়া ছড়িয়েছে সুমিতার মুদিত চোখে, তার ম্লান মুখের ওপরে। রুক্ষ চুল থেকে কতদিন আগেকার একটা তেলের ক্ষীয়মান গন্ধ এসে মিশেছে ঘরের ধূপের গন্ধের সঙ্গে—মণিকাদির কৈশোরে-তোলা ছবিখানা যেন সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ সস্নেহে সুমিতার চুলের ভেতরে আঙুল বুলোতে লাগল।

বাইরে কালো-নাগিনীর বিষ নিশ্বাস থেমে গেছে। কুটিল চক্রান্তের গুঞ্জন ছাপিয়ে রণিত হচ্ছে মল্লারের সুর। আজ সুমিতার বাসর। সুমিতা জানে এই প্রথম, এই শেষ। কাল থেকে অনিমেষের সময় থাকবে না, তারও না। একটি রাত্রির বর্ষণেই তার মরুভূমি চিরশ্যামল হয়ে থাকবে, একটি ফুলের গন্ধ তার চেতনাকে চিরদিন ঘিরে রাখবে। রাত্রির তমসা-তোরণ ভেদ করে যতক্ষণ সূর্য-সারথির আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিমির-যাত্রায় এই তার পাথেয় থাক।

আজ হাসপাতালে মণিকাদির নাইট ডিউটি, সকালের আগে ফিরবে না।

*　　*　　*　　*

বিলিতী সিনেমার বক্সে বসেছিল বাসুদেব আর রমলা।

সামনে শাদা পর্দায় মিউজিক্যাল কমেডির উত্তাল উল্লাস চলেছে। সমস্যাহীন জীবনে, বন্ধনহীন প্রেমে। ফ্ল্যাটে, মোটরে, হোটেলে, জাহাজে, সমুদ্রের ধারে। পৃথিবীতে এখন আর কিছুই নেই। এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘরের উত্তপ্ত আবহাওয়া সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। পুরু

কুশন, দামী শীতের পোষাক আনন্দিত অনুভূতিটার তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

জীবন কত সহজ—কত নিঝ ঞ্ঝাট। ফুলের মতো সুন্দর পৃথিবী। ভালোবাসো, ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠো। অর্কেস্ট্রার তালে তালে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দাও—দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে নাচের ছন্দে অপূর্ব ভঙ্গিতে লীলায়িত করে তোলো, পুরুষের দেহে রক্তধারা উদ্বেল উল্লাসে নাচতে শুরু করে দিক। তোমাদের মিলনশয্যা বিছিয়ে আছে সী-বীচে, পাম-গ্রোভে, আলোকোজ্জ্বল হোটেলে, ক্যাবারেতে। পৃথিবীতে চির-তারুণ্যের কন্দর্প উৎসব চলেছে।

বাসুদেব আস্তে আস্তে রমলাকে স্পর্শ করলে।

—তোমার ভালো লাগছে?

জড়িত মৃদুগলায় রমলা জবাব দিলে, হুঁ।

—কতদিন যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম? আজ যদি তুমি আমার জীবনে দেখা না দিতে,তাহলে হয়তো ওই হাইড্রোসায়ানিক—

বাসুদেবের মুখে হাত চাপা দিয়ে রমলা বললে, ছিঃ, চুপ করো।

বাসুদেব বললে, চুপ করব না। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, নতুন করে গড়ে তুলেছ আমাকে। আজ আমার জন্মান্তর।

রমলা বললে, আমারও।

রমলার আঙুলগুলো নিজের আঙুলের ভেতরে জড়াতে জড়াতে বাসুদেব বললে, জানো, আজকাল আমি রীতিমতো রোমান্টিক হয়ে উঠেছি।

—কবে তুমি রিয়্যালিস্টিক ছিলে?

—মনে নেই। আজ ভাবছি: "আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল-প্রেমের স্রোতে"—

রমলা বললে, থামো, কাব্যি রাখো। পাশের বক্সের ভদ্রলোক কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছো না ?

—হি ইজ জেলাস। আহা বেচারা, আই পিটি হিম।

এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড ঘরের ভেতরে চুরুট, প্রসাধন আর বিলিতি মদের চাপা গন্ধ ভাসছে একসঙ্গে। সমুদ্রতীরে নারিকেল-বীথি মর্মরিত হয়ে উঠছে, বালুবেলার ওপরে তরঙ্গে তরঙ্গে সফেন রোলার ভেঙে পড়ছে। নারিকেল-কুঞ্জের ভেতর থেকে যে বিচিত্র লতার পোষাক পরে নায়িকা বেরিয়ে এল সে পোষাকের অর্থ দেহশ্রীকে আবৃত করা নয়, তাকে আরো পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা। হঠাৎ কোথা থেকে চিতাবাঘের জাঙিয়া-পরা নায়ক এসে দেখা দিলে। তারপর মিলনের উত্তেজক রোমান্স। হুলাহুলা নাচের উন্মাদ উল্লাসে সফেন তরঙ্গের মতো যৌবনের মত্ততা। দর্শকের রক্তেও যৌবন কথা কয়ে উঠেছে—পুরু গদী-আঁটা চেয়ারে বসে অদ্ভুত ভালো লাগছে প্রশান্ত-সাগরীয় স্বপ্নলোককে। রমলার হাতের ভেতর বাসুদেবের স্পর্শ ক্রমশ যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

বাসুদেব রমলার কানের কাছে মুখ এনে বললে, যুদ্ধ থামলে আমরা ম্যানিলায় বেড়াতে যাব। নতুন করে আমাদের হনিমুন হবে ওখানে।

—বেশ।

কিন্তু যুদ্ধ থামলে। কথাটা রমলার কণে যেন খট করে বিঁধল। যুদ্ধ থামলে। কী বলেছিল সুমিতা, কী বলেছিল যেন আদিত্য-দা ? যুদ্ধ থামলে নতুন যুগ আসবে আমাদের, আসবে নতুন জগৎ। সেদিন পরাধীনতা থাকবে না, সেদিন আমরা আগামীকালের মানুষের জন্যে আগামী দিনের সমাজ গড়ে তুলব। আজ তার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি চাই প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে। আর তারই প্রতিধ্বনি করে ইন্দু লিখেছিল :

ছেঁড়া-তারে ঘেরা ভাঙা-ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে,

মৃত-সৈনিক উষার স্বপ্ন দেখে—

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

হাতে চাপ দিয়েছে বাসুদেব। কণ্ঠ মৃদু মৃদু কাঁপছে উত্তেজনায়: দেখছ কী রকম এক্সাইটিং। মেয়েটা কী দারুণ বকেটু।

এক মুহূর্তে বাস্তব জগতে ফিরে এল রমলা। ওসব ভেবে আর কোনো লাভ নেই বাস্তবিক। যা হারিয়ে গেছে তা হারিয়েই যাক, যা পেছনে পড়ে আছে তা পেছনেই পড়ে থাকুক। সবাই সৈনিক হতে পাবে না, রমলাও পারেনি। তার জন্যে অপরাধবোধ কেন? সুমিতাদি বৃহত্তবের সন্ধানে ছুটেছে, নিজের ছোট গণ্ডিটুকুতেই পরিতৃপ্ত আর পরিপূর্ণ হয়েছে রমলা।

সুমিতার নতুন যুগ যত দূরে, তার চাইতে রমলার ম্যানিলা অনেক কাছে। সুতরাং এয়ারকণ্ডিশন্‌ড্ ঘরে গদিআঁটা চেয়ারে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল রমলা। সামনে ম্যানিলার নারিকেল-বীথিতে চলেছে যৌবনের নির্লজ্জ উৎসব—জীবনে এ সত্যকেও তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

না,—রমলা অস্বীকার করতে চায়ও না।

সিনেমা শেষ হল। বাসুদেব ট্যাক্সি ডাকল।

রমলা বললে, কোথায় যেতে চাও?

—আমার বাড়িতে।

—ছিঃ, সেটা কি ভালো হবে? এখনো বিয়ে হল না—

—ওর জন্যে কী হয়েছে? অত বড় বাড়ি আমার—লোকজন নেই তো। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। বাছাবাছা ভেবোনা, কালই রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্ত করব।

—কিন্তু—

—তুমি বড় ভাবছো মন্তু। কালই তুমি আমার আমার হচ্ছো, আর শুধু

আজকের রাতটা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না? আর যাবেই বা কোথায়? ফিরতে হলে তোমাদের বিবেকানন্দ রোডের সেই পার্টি-অফিসে—

সাপের কামড় খাওয়ার মতো রমলা চমকে উঠল।

—না, না যাব। তোমার ওখানেই চলো।

ট্যাক্সি চলল। শীতার্ত রাত্রি—চারদিকে চলেছে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। অর্ধাবগুণ্ঠিত আলোগুলো বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—যেন কতগুলো মড়ার চোখ শুধু জেগে আছে কলকাতার ওপরে। বাসুদেব দুহাত দিয়ে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে রেখেছে রমলাকে। বৃষ্টিভেজা পথ মোটরের চাকার নিচে ছিটকে ছিটকে সরে যাচ্ছে।

এমন সময় শাড়কাটা গলি থেকে বেরুল হেমন্তবাবু।

নেশায় একেবারে চুরচুরে হয়ে গেছে—ভালো করে আর চলতে পারছে না। যার ঘরে ছিল, পকেটগুলো বেশ করে হাতড়ে নিয়ে সে হেমন্তবাবুকে বার করে দিয়েছে রাস্তায়। তারও ক্লান্তি আছে, শীতের রাত্রে লেপের মধ্যে প্রেমের মতো একটা স্নিগ্ধ ঘুমে মগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রলোভন আছে। তা ছাড়া হেমন্তবাবুর আর পয়সা নেই—সারারাত একটা ভবঘুরে বুড়ো মাতালকে বরদাস্ত করাও শক্ত।

অতএব হেমন্তবাবু বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।

টলতে টলতে একটা লাইটপোস্টকে আঁকড়ে ধরল, তারপর আবার ছিটকে সরে এল সেখান থেকে। ছেড়া ফ্ল্যানেলের জামার ফাঁক দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছে হাড়ের মধ্যে—এমন চমৎকার নেশাটার ভিৎ অবধি কাঁপিয়ে তুলছে। মাথার ওপরে টপ টপ করে পড়ছে শীতের বৃষ্টি। অবচেতনভাবে হেমন্তবাবুর মনে হতে লাগল: এই রাত্রে, এমন শীতে, পথে পথে বেড়ানোটা কোনো কাজের কথা নয়। কোথায় যেন তার জন্যে একটা আশ্রয় আছে, একটা উত্তপ্ত বিছানা আছে—যেখানে গিয়ে একটা পলাতক

কুকুরের মতো সে লুকিয়ে থাকতে পারে। সেখানে গেলে একখানা লেপ সে পাবে—হিমে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে-আসা হাত-পাগুলো উষ্ণতার আরাম পাবে, মাথাটা সেখানে এমনভাবে ভিজবে না। কিন্তু সে কোথায়, তদ্দূরে? নেশাটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে হেমন্তবাবুর, কিছুই ভালো করে মনে পড়ছে না।

সপ্—

জুতোশুদ্ধ, পা-টা পড়ল জলের মধ্যে। জুতো তো গেলই, জল মুখে চোখে পর্যন্ত ছিটকে এল। খানিকটা দুর্গন্ধ পচা জল—বোধ হয় কোনো ডাস্টবিন্ থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে এসেছে।

—শালার—একটা অশ্লীল গাল দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে হেমন্তবাবু।

চারদিকে অন্ধকার—কালো কালির মত অন্ধকার। তমসার নিশ্ছিদ্র যবনিকা দিয়ে কেউ যেন সবকিছুকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। সরু গলির মধ্যে চলতে চলতে নোনাধরা ঠাণ্ডা দেওয়ালে বারকয়েক ধাক্কা খেলো হেমন্তবাবু। জুতো দিয়ে বেড়ালের মতো কী একটা জানোয়ারকে মাড়িয়ে দিলে, তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সেটা। ছুঁচো।

—শালার—

টলতে টলতে হেমন্তবাবু বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল।

—শালার যুদ্ধ বেধেছে। সব অন্ধকার। পড়ুক—পড়ুক, বোমা পড়ুক। বাবুরা তো পালিয়ে বাঁচল, আমি এণ্ডি-গেণ্ডি ছানাপোনা নিয়ে পালাই কোথায়?—বিড বিড করে হেমন্তবাবু বকতে লাগল: পড—পড জাপানী বোমা—লাগ বাবা ভানুমতীর খেল। চুরমার হয়ে যা সব—খাস্তা হয়ে যা। খেঁদী মরুক, আমাকে ঘর থেকে বার করে দিলে। মরুক—মরুক—সব মরুক—

—কিন্তু—হেমন্তবাবুর নেশায় আচ্ছন্ন মগজের ভেতরে হঠাৎ চেতনার

বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। নিজের বাড়ির কথা এতক্ষণে মনে পড়েছে—পঞ্চানন শিকদার লেনের সেই একতলা ঘরখানার কথা। হঠাৎ হেমন্তবাবুর কান্না পেল। মরবে, মরবে? তার ঘর আছে, ছেলেপুলে আছে। টুনু, বুচি, বিজলী আছে, স্ত্রী আছে। না, না, কখনো বোমা পড়বে না। হেমন্তবাবু মরবে না, তারা মরবে না—সবাই বাঁচবে—

সবাই বাঁচবে। হেমন্তবাবুর মুখ চেয়ে এতগুলি প্রাণী বেঁচে আছে। মাথার ওপর টপ টপ করে বর্ষার জল পড়ছে—আস্তে আস্তে ফিরে আসছে সম্বিৎ। নাঃ—খুব অন্যায় হচ্ছে। আর নেশা করবে না হেমন্তবাবু। কাল থেকে এ পথে আর পা দেবে না সে। যুদ্ধ লেগেছে, যুদ্ধ একদিন থামবে; এই ব্ল্যাক-আউট থাকবে না, সূর্য উঠবে, অন্ধকার মিলিয়ে যাবে ছায়া হয়ে। সবাইকে বাঁচতে হবে।

জোর পা চালিয়ে দিলে হেমন্তবাবু নেশায় ক্লিষ্ট পায়ে যতটুকু জোর পাওয়া যায়। ঘরের কথা মনে পড়েছে, মনে পড়েছে টুনু—বুচি—বিজলীর কথা—

কিন্তু ভালো করে মনে পড়বার আগেই মাথায় যেন প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল। চোখের সামনে অন্ধকার কলকাতা ভেঙে গেল হাজার টুকরো হয়ে, শেষবারের মতো আলো দেখতে পেলো হেমন্তবাবু। রাশি রাশি আলো—অজস্র আলো—হাজার হাজার ফুলঝুরির ঠিকরে-পড়া গণনাতীত আলো!

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মুহূর্তের জন্যে ব্রেক কষলে, পরক্ষণেই বিদ্যুতের মতো ছুটিয়ে দিলে গাড়িটাকে।

রমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। ব্যাকুল গলায় বাসুদেব বললে, এই রোখো, রোখো, আদমী চাপা পড়ল যে—

ড্রাইভার গাড়ি থামাল না, বরং আরো স্পীড বাড়িয়ে দিলে।

—রোখো রোখো—

—চুপ চাপ রহ বাইয়ে বাবুজী, মাতোয়ালা থা—ড্রাইভারের কণ্ঠ নিরাসক্ত।

—তাই বলে—

ড্রাইভার যেন ধমক দিলে এইবার। পুরো বহরের ছয়হাত পাঞ্জাবী, গলার স্বরে কর্কশ নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরুল: বাস্ বাস্। পুলিশ পাকড়নেসে আপকো ভি মুস্কিল হো জায়গা। উও মাতোয়ালা থা, মোটরকা আগমে আ পড়া—

তা সত্যি। মাতাল নিজের দোষে চাপা পড়েছে—তার জন্যে কে দায়ী? যে মাতাল সে গাড়ি চাপা পড়বেই, হয় বাসুদেবের, নইলে আর কারুর। বাসুদেবের ট্যাক্সির নিচে সে স্বর্গলাভ করল এ দুর্ভাগ্য তার নয়, বাসুদেবেরই।

অতএব—

অতএব আরো জোরে ছুটিয়ে চলো মোটর। শীতের রাত্রির গরম বিছানা, নিশ্চিন্ত আরাম। এমন সময় পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ার অর্থ যে কী শোচনীয় তা বাসুদেব জানে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কতদিন যে তার জের চলবে বলতে পারে।

তা ছাড়া যুদ্ধ থামলে রমলাকে নিয়ে পার্ল হারবারে যাবে বাসুদেব, যাবে ম্যানিলায়। সে বহু দূরের পথ। এখানে এখনি তার ট্যাক্সি থামালে চলবে কেন।

তেরো

ওদিক বেশ জমিয়ে নিয়েছে আদিত্য।

জেলখানার একটি মনোরম ঘরে সে আশ্রয় পেয়েছে। আদিত্য ভাবছে: হমেনস্ত্—হমেনস্ত্। স্বর্গসুখ ভোগ করা আর কাকে বলে। দিল্লীর দেওয়ানীখাস যাঁরা গড়েছিলেন—তাঁদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে জেলখানার এই ইন্দ্রপুরী তাঁরা দেখতে পেলেন না।

কত বড় বাড়ি, আর তার কী রাজকীয় বন্দোবস্ত। আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর, লোহার শিকের বেড়া। অতি সাবধান, অতি সতর্ক। পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই এখন তাকে স্পর্শও করতে পারে। সে আজ রাজবাড়ির অতিথি—স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বলে মনে হচ্ছে। বাগানের মালিক খুন হয়েছে, তদন্ত [illegible] কলকাতার আমদানী আদিত্যকে ধরা [illegible] কেন [illegible] কিছুই সে জানে না। কিন্তু কিছু [illegible] গ্রেপ্তার [illegible] যাচ্ছে বেশি কিছু বোঝবার [illegible] আগেই [illegible] হয়ে যাবে। বেঁচে থাকুন রাজা হবুচন্দ্র আর তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী। মনুষ্যকে তাঁরা অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শুধু একটা জিনিষ খচখচ করছে মনে। অনিমেষের হল কী? এমন [illegible] চিঠি দিয়ে ডেকে আনবার ষড়যন্ত্রটাই বা কী হতে পারে? কিছু করতে পারল না আদিত্য। লাভের মধ্যে ডি-এস পি তাকে অনেক তর্জন গর্জন করলেন, স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে পাঁয়তারা ভাঁজলেন অনেকখানি।

—Perhaps you know many things about the murder Babu! Confess it like a nice chap and get rid of all these troubles!

—বিশ্বাস করো সাহেব, আমি কিছু জানিনে।

—ইম্‌পসিবল্‌! আমি বলিটেছে—টোমাকে কন্‌ফেস করিটে হইবে।

তুমি তো বলিতেছে—কিন্তু আমাকে কী কন্‌ফেস করিটে হইবে? মেনে নিতে হবে যে, আদিত্য রবার্টসকে খুন করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের দায়মুক্তি হয়ে যাবে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নিশ্চিন্তমনে পাইপ ধরাবে শ্রীমান! আদিত্য পরোপকার করতে নেহাৎ অরাজী নয়; কিন্তু দধীচির মতো অত বড় আত্মত্যাগে তার আপত্তি আছে। তা ছাড়া উপকার করবার লোকের অভাব নেই সংসারে, সাহেবকে ঠিক অতখানি যোগ্য ব্যক্তি বলে কোনোমতেই আদিত্য মেনে নিতে পারেনি।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। নিশ্চিন্তে হাজতে আশ্রয় পেয়েছে আদিত্য। কলকাতায় খবর পাঠিয়েছে, ওখান থেকে যতক্ষণ ব্যবস্থা না হয়, ততক্ষণ এখানেই বাস করতে হবে। তা ছাড়া যে রকম ব্যাপার—জামিন দিলে হয়।

সাহেব চটে বলেছে, আমি টোমাকে ডেখিয়া লইবে।

আদিত্যের হাসি পেয়েছিল। জবাব দিয়েছে, লইয়ো। তারপর সাহেবের ভাষার প্যারডি করে বলেছে: শাদা চোখে ডেখিতে না পারিলে, মাইক্রোস্‌কোপ লইয়া ডেখিয়ো।

দুঃখের কথা, সাহেবের রসজ্ঞান নেই। সুতরাং ঘৃতাহুতি পড়েছে আগুনে। বলেছে: টুমি বড্‌মাস আছে।

—তাতো আছেই। 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ' ইতি দুই বিঘে জমি।

সাহেব খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে আদিত্যের মুখের দিকে। পাগল নয়তো লোকটা?

তারপর বলেছে, লে যাও।

—তোমারও দিন একদা আসবে বৎস—সেদিন আমিও তোমাকে দেখিয়া লইবে—স্বগতোক্তি করে পুলিসের পাহারায় চলে এসেছে আদিত্য। নীল চোখদুটোতে প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আড়াল থেকেও ঝড় ঝিকিয়ে উঠেছে। যতদূর মনে হচ্ছে কিছুই হবে না, দিন কয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে শুধু। কিন্তু কাজ নষ্ট হয়ে গেল। অনিমেষের কী হল, ব্যাপারটাই বা কী ঘটেছে, আসলে কিছুই বুঝতে পারছে না।

সুতরাং আপাতত কম্বলাসনে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। যোগনিদ্রাই বটে! হাজতীয় কম্বলের এই মনোহর শয্যায় যোগী ছাড়া শয়নানন্দ উপভোগ করা একটু শক্ত। লোহার খোঁচা খোঁচা তারের মতো কম্বলের রোঁয়া, তার সঙ্ঘর্ষে গায়ের ছাল-বাকলশুদ্ধ উঠে আসবার উপক্রম করে। ঘষায় ঘষায় রক্তও গড়ায় কখনো কখনো। পুলিসী শাসনের সুযোগ্য সহকারীরূপে তার ভেতরে কৌরব-অক্ষৌহিণীর মতো অগণ্য ছারপোকা রৌরবযন্ত্রণা স্মরণ করিয়ে দেয়। হঠাৎ আদিত্যের একটা থিয়োরী মনে এল। রাজদ্রোহীদের দমন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ফাঁসিকাঠ নয়; ফরাসী তুড়ুং ঠোকবার মতো এই একখানা কম্বল বাধ্যতামূলকভাবে গায়ে জড়িয়ে রেখে তাদের তিনদিন ঠায় বসিয়ে রাখা। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। ফাঁসির চাইতে সেটা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ এবং হিতকর হবে।

ঠিক আদিত্যের ভাবনার প্রতিধ্বনি করেই যেন পাশের যোগশয্যা থেকে আর একজন যোগী বললে, উঃ, শালার কী ছারপোকা রে! 'বাগ' নয়তো 'বাঘ'!

বোঝা গেল, লোকটির ইংরেজি বিদ্যা আছে। হঠাৎ আদিত্যের কৌতুকবোধ হল। একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছেও হল সঙ্গে সঙ্গে।

—ঠিক বলেছেন মশাই। একেবারে সোঁদরবনের বাঘ। চুষে আঁঠি শুধু বের করে ফেললে। জাতে ইংরেজ নিশ্চয়।

ঘরে দুর্গন্ধ অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আদিত্য টের পেলো সমর্থন পেয়ে পাশের বিছানার লোকটি উৎসাহিত হয়ে উঠে বসেছে।

—আপনিও ভদ্রলোক নাকি! বাঁচালেন মশাই, একটা কথা কইবার লোক পাওয়া গেল। খোট্টা আর মেড়োর পালের ভেতরে পড়ে প্রাণটা ছট্‌ফট করছিল। তারপর, এখানে ঢুকলেন কী মনে করে?

—সাধ করে কি আর ঢুকেছি। ধরে ঢোকালে আর কী করতে পারি বলুন?

—তা বটে।—উত্তরে পাশের ভদ্রলোকটি খুশি হয়েছে বলে মনে হল: কী করেছিলেন?

আদিত্য নিরাসক্ত গলায় জবাব দিলে, বেশি কিছু নয়, এক ভদ্রলোকের পকেট হাতড়েছিলাম।

—আরে, একই দলের যে—ভদ্রলোকটি রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল: আমারও অবস্থা ওই রকম। বললাম, বিড়ি খুঁজছিলাম—তা বিশ্বাস করলে না। বলে, পরের পকেটে কেন? জবাব দিলাম, ভিড়ের মধ্যে নিজের আর পরের পকেট বুঝতে পারিনি। তা ব্যাটাদের ধর্মভয় নেই, ব্রাহ্মণ সন্তানকে এনে হাজতে ঢোকালে। পাপের ভরা ওদের পূর্ণ হয়ে উঠেছে মশাই, দেখবেন দুদিন পরেই জাপানী বোমা ওদের ঠাণ্ডা করে দেবে।

যাক, সঙ্গটা ভালো। একে ভদ্রলোক, তার ওপরে ব্রাহ্মণ সন্তান।

—ঠিক বলেছেন। ব্রহ্মশাপ ক্ষত্রিয় পরীক্ষিৎ এড়াতে পারলে না তো ম্লেচ্ছ ইংরেজ কোন ছার!

—আপনি সমঝদার লোক। বিড়ি আছে দাদা?

—না মশাই, কোথায় পাবো?

—ধ্যাৎ, কোনো কাজের নন আপনি। পয়সা-টয়সা লুকোনো আছে কোথাও? থাকে তো দিন না একটা সিকি, ওয়ার্ডার ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করলে হয়তো মিলতে পারে।

—না, পয়সাও নেই।

—ধ্যাৎ—কিছু হবে না আপনাকে দিয়ে—ব্রাহ্মণসন্তান আবার নিরাশচিত্তে কম্বলাসন গ্রহণ করলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, এই বুঝি প্রথম এলেন?

—হুঁ—আর আপনি?

—এবার নিয়ে বার পাঁচেক হল। কী করব মশাই। লেখাপড়া শিখিনি, চাকরি পাই না। ঘরে বউ আছে, ছেলেপিলে আছে। বাঁচতে তো হবে একরকম করে!

বাঁচতে হবে। সব চাইতে বড় কথা, সব চাইতে নিষ্ঠুর আর নির্মম সত্য। কিন্তু বাঁচবার অধিকার নেই। প্রতি পদে পদে তাদের খর্ব করো, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের ঠেলে দাও সুস্থ জীবন আর সহজ মনুষ্যত্বের সীমারেখার বাইরে—গ্লানি আর অপরাধের ক্লেদ-পঙ্কিল অন্ধকার গহ্বরটার ভেতরে। সেখানে তারা হাহাকার করুক, তারা আর্তনাদ করুক—আকাশ-ফাটানো গলায় স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে অভিসম্পাত করুক। কিন্তু তোমরা তা শুনতে পাবে না। তোমাদের এখন 'জাজ্' রেকর্ডে নাচের সুর বাজছে, তোমাদের রূপালি পর্দায় এখন কোকোনাট-গ্রোভের প্রেমস্বপ্ন মদির হয়ে উঠেছে, তোমাদের বেতারযন্ত্রে এখন কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে বিজয়ী বাহিনীর জয়যাত্রার ইতিহাস। সম্মুখের রণাঙ্গনে তোমাদের সেনাবাহিনী কামান গর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে—তাদের বুটের তলায় পড়ছে রক্তের ছাপ—ঔপনিবেশিক মৃত্তিকার অধিকার নিয়ে ক্ষমতালুব্ধ শক্তির সংগ্রাম। তোমরা পেছনের কালো গহ্বরের দিকে তাকিয়ো না। উপনিবেশকে আয়ত্ত করো, কিন্তু উপনিবেশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো না;

দুঃখ পাবে, লজ্জা পাবে, নিজেদের কীর্তির পরাকাষ্ঠায় নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তার চাইতে জাজ্ রেকর্ড, সিনেমার গান, বেতারের প্রচণ্ড কলরব এবং রণাঙ্গণের কামান নির্ঘোষের মধ্যেই শ্রবণেন্দ্রিয়কে ডুবিয়ে দাও—এত বড় জগৎ—এমন বিপর্যস্ত বিপ্লববিক্ষুব্ধ জগৎ তার মাঝখানে বিন্দুবৎ হয়ে মিলিয়ে যাবে। মনে রেখো, অনেক মানুষকে অমানুষ না করলে তোমরা অতিমানুষ হতে পারবে না।

আদিত্য আস্তে আস্তে বললে, হাঁ, বাঁচতে হবে বইকি।

—কিন্তু বাঁচতে দিচ্ছে কে দাদা? যা যুদ্ধ বেধেছে। আমি চলে এলাম জেলে—ছেলেপুলেগুলো না খেয়ে মরবে। ব্যাটারা এনে জেলে ঢোকাতে পারে, কিন্তু খেতে দিতে পারে না কেন বলতে পারেন মশাই?

—যেদিন খেতে দিতে পারবে, সেদিন আর জেলখানা থাকবে না। খেতে দিতে চায় না বলেই তো পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার জেলখানা ওরা গড়ে রেখেছে।

লোকটি কী বুঝল, কে জানে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপরে বললে, হুঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

বাইরে থেকে সেন্ট্রি ধমক দিলে রূঢ় গলায়।

—অ্যাই, বাত্‌চিত মত করো। চুপসে নিঁদ যাও—

ধর্মরাজ্যের ধর্মশালায় অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে দূরে কাছে সেন্ট্রির জুতোর শব্দ বিচিত্রভাবে পাষাণ-পুরীর অস্ত্য-প্রত্যঙ্গে পড়তে লাগল মূর্ছিত হয়ে, আর অকারণে কাণ পেতে শব্দটা শুনতে লাগল আদিত্য।

হাজতেও কুলোয়নি। সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত আদিত্যকে পাঠিয়েছে শহরের জেলখানায়। চলছে এন্‌কোয়ারি। চলছে হুলুস্থুলু। এমন একটা

ভয়ঙ্কর কাণ্ডের ফয়শালা করতে না পারা পর্যন্ত ছাড়ান নেই আদিত্যের। কয়েকটা সাঁওতাল কুলি আর একজন জমাদারকেও ধরে আনা হয়েছে, উৎপীড়ন চলছে সমানে। কিন্তু এখনো যে তিমিরে, সেই তিমিরে। ঘন জঙ্গলের কোন্ অন্ধকার থেকে তীরটা যে উড়ে এসেছিল, আজো তার হদিস মেলেনি।

পুলিশের কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করেন।

—মিস্টার রায়?

—আদেশ করুন।

—আপনি একজন সম্মানিত জার্নালিস্ট্।

—সম্মানিত কিনা জানিনা, তবে চাকরী করে খাই খবরের কাগজে। এবার সে বন্ধনও মোচন হল আপনাদের অনুগ্রহে।

পুলিশ কর্মচারী ভ্রূকুঞ্চিত করেন: মানে?

—মানে, খুনের আসামী অ্যাকুইটেড্ হলেও কি আর চাকরী থাকবে তার?

পুলিশ কর্মচারী গম্ভীর হয়ে যান: না, খুন আপনি করেননি এটা বোঝবার বুদ্ধি আছে আমাদের। কিন্তু কথাটা কী জানেন, আপনার একটা লং পোলিটিক্যাল্ ক্যারিয়ার রয়েছে, পুলিশ-রিপোর্ট বড় খারাপ আপনার বিরুদ্ধে।

আদিত্য হাসে।

পুলিশ কর্মচারী বলেন, তবে দ্যাট্ অনিমেষ ব্যানার্জি ইজ্ সার্টেন্লি রিলেটেড্ টু দিস মার্ডার। সমস্ত ব্যাপারটাই পোলিটিক্যাল। গণ্ডগোল সেখানেই বেধেছে। আমার খবর পেয়েছি যে অনিমেষ বাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা পোলিটিক্যালি অ্যাণ্ড্ সোস্থালি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদের কিছু হেল্প করেন—You know, it affects you in no way—

—আমার বিনা সাহায্যেই এতটা যদি জানতে পেরে থাকেন, তবে এর পরেও আমার কোনো সহায়তা দরকার হবেনা আপনাদের।

—ভালো করছেন না। You are creating unnecessary harassments for yourself—

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যান।

কথাটা আদিত্য নিজেও ভাবতে চেষ্টা করে। সত্যিই কি এই খুনের সঙ্গে অনিমেষের সম্পর্ক আছে নাকি কোনো রকম? একটা সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষেপে ওঠে সে কি এদের কোনো রকম উৎসাহ দিয়েছিল এই জাতীয় নরঘাতনের? কে জানে।

কিন্তু বিশ্বাস হয় না। অনিমেষকে এর চাইতে স্বাভাবিক আর প্রকৃতিস্থ বলেই জানে সে। কোনো পার্টি ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে ব্যাপারটা বোঝা যেত। কিন্তু সে সুযোগই পেলনা, পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধূলোপায়ে চলে আসতে হল হাজতে। তা ছাড়া কাছাকাছি কোনো পার্টি-সেলও ছিল না—যতদূর মনে হচ্ছে। এ এরিয়ায় অন্তত খুব সম্ভব অনিমেষই পায়োনীয়ার, তাই গণ্ডগোলটা জট পাকিয়েছে এত বেশি।

ইতিমধ্যে জেলে এল আর একটি মানুষ।

রোগা, লম্বা চেহারা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। চোখে-মুখে শান্ত একটা উজ্জ্বল ভঙ্গি। জেলার বললেন, ইতি আপনার সগোত্র।

—মানে?

আর কিছু না বলেই বেরিয়ে গেলেন জেলার।

লোকটি বিহারী। কিন্তু ঠিক সাধারণ বিহারী নয়, বেশ বোঝা যায় রীতিমতো সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

লোকটি বললে, নমস্কার আদিত্যবাবু।

আদিত্য সবিস্ময়ে বললে, আপনি আমাকে চেনেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কই, আমি তো আপনাকে—

—না, আপনি আমায় চিনবেন না। ব্যানার্জিবাবু, মানে অনিমেষবাবু আমায় জানেন।

আদিত্যের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—তা হলে—

—আমার নাম ধরমবীর পাণ্ডে। রংঝোরা বাগানের কাছে আমার কাঠের গোলা।

—ওঃ, বুঝেছি। আমাকে আপনিই তো চিঠি দিয়েছিলেন।—আদিত্য তেমনি আশ্চর্য হয়ে বললে, কিন্তু আপনি এখানে এলেন কিসের জন্যে?

—ইচ্ছে করে কি কেউ আসে এখানে? উজ্জ্বলভাবে হেসে উঠল ধরমবীর: নিয়ে এল ওরা। আর কারণ? আপনার যা, আমারও তাই।

—বসুন, বসুন। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে তো!

ধরমবীর বসল। বললে, আপনার খুব খটকা লেগেছে বুঝতে পারছি। কিছুই আপনি জানেন না। কিন্তু—এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধরমবীর বললে, আমি জানি।

আদিত্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

—কী জানেন আপনি?

গলা নামিয়ে ধরমবীর বললে, জানি কে খুন করেছে রবার্টস্‌কে।

—কে?—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল আদিত্য: কে?

—আস্তে—আবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ধরমবীর বললে, আপনি ভয় পাবেন না। জেনে রাখুন, অনিমেষবাবুর সঙ্গে এ খুনের কোনো সম্পর্ক নেই, এর বিন্দু-বিসর্গও জানা নেই তাঁর।

—তা হলে কে?

—নামগুলো নাহবা বললাম আপনাকে—ধরমবীর মিষ্টি করে হেসে উঠল: আমি জঙ্গলের মানুষ, ওখানকার প্রত্যেকটা পাতার শব্দ অবধি শুনতে পাই

আমি। খুন অনিমেষবাবু করান নি, করেছে তারাই, এ অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বলি যারা—যাদের জন্যে অনিমেষবাবুর লড়াই।

বুকের ওপর থেকে যেন মস্ত বড় ভার নেমে গেছে একটা। হৃৎপিণ্ড ভরে যেন খানিকটা বাতাস টেনে নিতে পারল আদিত্য : তবু এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু পারা তো উচিত ছিল। ধরমবীর তেম্‌নি স্নিগ্ধ মুখে হাসল : এতো আপনাদেরই কথা।

আদিত্য তাকিয়ে রইল।

—শুনুন, আপনারা যাদের জাগাতে চেয়েছিলেন, তারা জাগছে। এবার তাদের পথ তারাই করে নেবে—আপনাদের আর এগিয়ে দিতে হবে না।

—তা হলে এ ওদের স্বতোৎসারিত?

—তাই তো নিয়ম। প্রয়োজনটা ওদের, ওদের দাবীও যে তাই আপনা থেকেই ফুঁসে উঠছে বুকের ভেতরে। তা ছাড়া ওরা বনের মানুষ। দুদিনের জন্যে ঝিমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু বুনো শক্তিতে জেগে উঠতেও ওদের বেশি সময় লাগে না। একটু উৎসাহ পেলেই ওদের হাতের বল্লম ধারালো হয়ে ওঠে—ওরা বিষ মাখিয়ে নেয় ওদের অব্যর্থ কাঁড়-বাঁশে।

আদিত্য শুনে যেতে লাগল নীরবে।

ধরমবীরের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল : একদিন এসেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের বান, চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রবল শক্তিতে। সে আগুন আজো লুকিয়ে আছে ওদের রক্তে। আপনারা কলকাতায় বসে যার জন্যে স্বপ্ন দেখছেন, এখানে আপনা থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে তার জমি। দেখবেন হয়তো এই জঙ্গল থেকেই একদিন জ্বলবে দাবানল—সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

—আপনি বিশ্বাস করেন?—সাগ্রহে প্রশ্ন করল আদিত্য।

—করি।—শান্ত গলায় ধরমবীর বললে, কিন্তু আপনাদের পথে নয়। আমার বিশ্বাস আলাদা।

—কী সে বিশ্বাস ?

—আমি মহাত্মাজীর সেবক। আমার মন্ত্র অহিংসা। আমি বিশ্বাস করি, সেই অহিংসার জোরেই ওদের ভেতরে সত্যিকারের বিপ্লব ঘটানো যায়। আর শুধু বাইরের বিপ্লবই নয়, ওদের মনেও যদি বিপ্লব না ঘটে, তা হলে শুধু রক্ত ঝরিয়ে আরো রক্তকেই ডেকে আনা হবে। রক্তের শেষ নেই, ও এমন ভয়ঙ্কর নেশা যে নিজের খিদেয় ক্রমাগতই ইন্ধন যোগাতে থাকে।

আদিত্য উত্তর দিল না, মৃদু হাসল।

—জানি, একথা আপনাদের ভালো লাগবে না। আপনারা গণ-শক্তির রাক্ষস-রূপটাকেই জাগাতে চাইছেন, তার আত্মাকে নয়।

আদিত্য বললে, ভুল করছেন। আত্মার বিরুদ্ধে আমরাও বিদ্রোহ করিনি। রক্ত ঝরাতে আমরাও চাইনা। অন্যায়কে দূর করবার জন্যে এবং নতুন সমাজকে গড়ে তোলবার জন্যে যেটুকু শক্তি দরকার সেইটুকুই অর্জন করতে চাই আমরা।

শ্রান্ত স্বরে ধরমবীর বললে, কিন্তু শক্তি একবার এই ভাবে বাড়তে থাকলে শেষ পর্যন্ত কি তাকে রাশ টেনে সামলে রাখা যায় ?

—শক্তির নামে ভয় পাচ্ছেন কেন ?—মৃদু হাসল আদিত্য : লোহা দিয়ে শুধু তো তলোয়ারই তৈরী হয়না। তার চাইতে ঢের বেশি কাজ হয় তা দিয়ে, গড়ে ওঠে অনেক বড় কল্যাণ। তলোয়ার রক্ত ঝরায় বলে দোষটা লোহার নয়, দোষ তারই—যে লোহাকে ব্যবহার করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরমবীর বললে, লোহা জিনিষটারই দোষ আছে। ওর দুটো রূপ। মানুষের জন্যে কল তৈরী করলেই সেই কলকে রক্ষা করবার জন্যেতৈরী করে নেয় বন্দুক।

—তাহলে কলকেও আপনি মানেন না ?

—না।

—কিন্তু আপনার পায়ের জুতো থেকে পকেটের কলমটা অবধি সবই যে এই যন্ত্রের দান। আজ কি আপনি বাকলের যুগে ফিরে যেতে রাজী আছেন ?

—সে কথা আমি বলিনি। মানুষের যতটুকু প্রয়োজন, সেই নিজস্ব প্রয়োজনটুকু যদি সে নিজের হাতে গড়ে নিতে পারে, নিজের তাঁতে—ছোট কারখানায়, তা হলে তো আর এ বিরোধ থাকেনা, এ রক্তও না।

আদিত্য হাসল : কিন্তু বড় কলের মালিক যে তাকে গ্রাস করে ফেলে। মানুষকে তারা নিজের ছোট গাণ্ডতে খুশি হয়ে বাঁচতে দেবে কেন ? বড় কল গড়ে উঠবেই—তাকে আর ঠেকানোর উপায় নেই।

—তা হলে চিরকাল ঝরবে এই রক্ত ?

—না।—আদিত্যের নীলিম চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : না, ঝরবে না। ঢের বড়, আরো অনেক বড় কল গড়ব আমরা। সমস্ত দেশের মানুষের নিজস্ব ছোট প্রয়োজনটুকুকেও যদি মেটাতে হয় তা হলে এমনি হাজার হাজার কলেও যে কুলোবে না পাণ্ডেজী ! কয়েকজন মালিকের কোটি কোটি টাকার মুনাফাকে যদি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমরা বিলিয়ে দিতে পারি—সেদিন সব রক্তপাতই বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে। আজ যে শক্তি আমরা সঞ্চয় করছি অধিকারের জন্য, কাল সেই শক্তিকে আমরা ব্যয় করব সংগঠনের জন্য, কল্যাণের জন্য।

—কিন্তু আত্মার বলে তা কি হয়না ? শুভবুদ্ধি দিয়ে মানুষকে ফেরানো যায় না অন্যায়ের হাত থেকে ?

—সে চেষ্টায় পৃথিবী হাজার হাজার বছর ব্যয় করেছে পাণ্ডেজী। বুদ্ধ সাধনা করছেন, রক্ত দিয়েছেন খ্রীস্ট। আর আমরা অপেক্ষা করতে পারব

না। শরীরটাকেই যদি বাঁচাতে না পারি, তা হলে আত্মার চর্চা করবার জায়গা পাব কোথায় বলুন ?

বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো ধরমবীর। আদিত্যের কথার মধ্যে হয়তো তার নিজের অজ্ঞাতেই এসে গেছে ব্যঙ্গের আভাস—একটুখানি শ্লেষের আমেজ। এরা মানবে না, এরা বিশ্বাস করবে না। এরা প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে সব কিছু বিচার করে, এরা মনকে শারীরিক একটা প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত মূল্য বলে মনে করে না।

কিন্তু সত্যিই কি ভুল করেছেন খ্রীস্ট ? ভুল করে গেলেন বুদ্ধ ? মহাত্মাজীর এই সাধনাও কি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে ?

অসম্ভব। অনেক তর্ক করেছে অনিমেষ, বুঝিয়েছে অনেক, বইও পড়িয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু কিছুতেই মানতে পারবেনা ধরমবীর। মনে পড়ে, মহাত্মাজীর কাছে সেই প্রশ্ন :

—"যদি আপনার পেছনে একটা গভীর খাদ থাকে, সামনে ফণা উঁচিয়ে থাকে একটা বিষধর সাপ এবং হাতে থাকে একখানা লাঠি ? কী করবেন আপনি ?"

—"আমি হাতের লাঠিটাই ফেলে দেব, পাছে সাপটাকে মারবার জন্মে প্রলোভন জাগে আমার মনের ভেতরে।"

এতবড় উপলব্ধি—এতবড অহিংসা, কোনো মূল্য নেই এর ? এ শুধু ভাববিলাস ? শুধু ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তি ? একি শুধু একটা আলেয়ার পেছনেই ছোটা—নিজেই অজ্ঞাতেই বণিক ধুরন্ধরের স্বার্থসিদ্ধি করে চলা ?

অনিমেষ বলেছিল, ভাববাদী দর্শনের ফাঁকি তো ওইখানেই। মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়, আত্মগোপন করে নিজের নিরাপদ কোটরে।

ধরমবীর বলত, চোখের দেখাটাকেই যারা বড় বলে মনে করে, অতবড় কথা তারাই বলবে। কিন্তু একটা আলাদা ধ্যানের দৃষ্টিও থাকতে

পারে—একথা অস্বীকার কোরোনা ব্যানার্জি বাবু। বাপুজী সেই দৃষ্টিই পেয়েছেন।

আদিত্য যেমন করে হাসল, তেমনি করেই সেদিন হেসেছিল অনিমেষ।

হঠাৎ দৃপ্ত চোখে ধরমবীর তাকালো আদিত্যের দিকে : আপনারা আজ বস্তুতান্ত্রিক চোখ নিয়ে খালি যুক্তির পথটাই দেখছেন। কিন্তু সাড়া কি জাগাতে পেরেছেন মহাত্মাজীর মতো? আনতে পেরেছেন উনিশ শো তিরিশ সালের মতো সে আবেগ?

—যুক্তির নিয়ম আবেগের মতো নয় পাণ্ডেজী। সে আসে দেরীতে, কিন্তু তার পাকা শড়ক, বেনো জলে ভেঙে পড়ে না দুদিন পরেই।

ধরমবীর বললে, আমি মানি না। এ আবেগ বানের জল নয়, পাহাড়ী ঝর্ণা। যত দিন যাবে, যুক্তির ভারে যত ক্লান্ত হয়ে উঠবে মানুষ, ততই বেগ বাড়বে এই ঝর্ণার, নদী হয়ে উঠবে—পৌঁছুবে মানুষের মুক্তি-সাগরে। মহাত্মাজী সেই চিরকালের শান্তি-সাগরের ডাকই বয়ে এনেছেন। একদিন আপনারাও তা শুনতে পাবেন।

আদিত্য হেসে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ধরমবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর সে হাসতে পারল না। মনে হল একটা আশ্চর্য বিশ্বাস আর গভীরতায় সে দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে। হোক সে 'অচলায়তনের অধিবাসী, কিন্তু মহাপঞ্চকের ধ্যান-সাধনার মতো যেন চলে গেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ধরমবীর বললে, এতদিন এসব কথা এমন করে ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে শুধু ডাণ্ডী সত্যাগ্রহেই শেষ হয়ে যায়নি আমার কাজ। রবার্টসের এই খুন আমাকে আরো ভাবিয়ে তুলেছে। দেখছি, আমাকেও কিছু করতে হবে এখন। আজ চা বাগানে যারা জাগছে, তাদের সেই আত্মার পথই আমাকে দেখাতে হবে—ধরমবীর হেসে উঠল : আপনাদের সঙ্গে এব পর

আমারও বিরোধ বাধবে। তবে ভয় নেই, আপনারা আঘাত দিলেও অস্ত্র আমরা ধরবনা।

অনেক কথাই বলতে পারত আদিত্য। তার বিজ্ঞান এবং রাজনীতির ধারালো ফলার মুখে মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত ধরমবীরকে। কিন্তু কিছুই করল না সে, একটি কথাও বলল না। মহাপঙ্ক আজ তার ধ্যানের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, বাইরের কোনো শক্তি সে ধ্যান সহজে ভাঙাতে পারবে না।

চৌদ্দ

চা বাগানে জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছে।

দু হাজার 'একার' প্ল্যান্টেশনের ওপরে স্থির দাঁড়িয়েছে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ: শীতের রাত্রে আকাশে ম্লান কুয়াশার অস্পষ্ট ছায়া আবর্তিত হচ্ছে—কিন্তু মেঘ নেই কোনোখানে। দিগন্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণমুকুটকে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না—শুধু একটা অতিকায় কৃষ্ণতার ওপরে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে খানিকটা ম্লান তাম্রাভ দীপ্তি। ডুয়ার্সের ঘন অরণ্য জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে অপরূপ হয়ে আছে।

দু হাজার 'একার' প্ল্যান্টেশনের ওপরে জ্যোৎস্না ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কুয়াশায় একটুখানি ফিকে, একটুখানি বিষণ্ণ। তবুও আকাশ-গলা জ্যোৎস্না, নরম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না—বাসর-রাত্রির বাতায়নে প্রসন্ন আশীর্বাদের মতো পিছলে-পড়া চিরন্তন জ্যোৎস্না। চা-বাগানের বিস্তার্ণ শ্যামলতার ওপরে তার শুভ্র প্রলেপ পড়েছে, যেন কালো সাঁওতাল মেয়ের মুখে চন্দনের পত্রলেখা পরিয়ে দিয়েছে কেউ।

এমন রাত্রে বাগানের শোষিত পীড়িত কুলিরাও যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ওঠে। ওই জ্যোৎস্না যেন সাঁওতাল পরগণার পাহাড় আর মহুয়া ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় নেই—মহুয়াও নেই। আছে ফ্যাক্টরী, আছে ম্যানেজার, আছে ক্ষুদে লাটবাবুরা আর আছে অত্যাচার। তবু এমনি রাত্রে মহুয়ার বদলে ওরা সরকারী মদে বন্য যৌবনকে জ্বালিয়ে তোলে, এমনি রাত্রে ওদের মাদলে পাহাড় ভাঙা পাগলা ঝরণার ছন্দ লাগে।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। এ যুগ আলাদা, একালের রূপ স্বতন্ত্র। এদেশ সাঁওতাল পরগণা নয়। সহজ অরণ্য-জীবনের সরল কাব্য যান্ত্রিক জটিলতার প্রত্যক্ষ সংঘাতের রূপ নিয়েছে। শুধু বিচ্ছিন্নভাবে এই চা বাগানেই নয়, সমগ্রব্যাপী বিপ্লব-সমুদ্রের জোয়ার এসে দোলা দিয়েছে ওদেরও ধমনীতে।

চা বাগানের পাশেই ফরেস্ট শুরু। ডুয়ার্সের যোজনব্যাপ্ত শালবনের একটি প্রান্ত জ্যামিতিক ত্রিভুজের সূক্ষ্মাগ্রের মতো রং-ঝোরা চা-বাগানকে ছুঁয়ে গেছে। চা বাগানের পাশে সেই শালবনের ভেতরে কুলিদের বৈঠক বসেছে।

গভীর রাত—ঘুমন্ত অরণ্য। বাতাস নেই, শালের পাতার শিরশিরানি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। ঘুমিয়েছে হরিয়াল, ঘুঘু, বনমুরগী। জঙ্গলের মধ্যে সতর্ক পায়ে চলা সম্বর আর চিতি হরিণের চোখেও যেন ঘুম জড়িয়ে এসেছে। শুধু ঝোপের আড়ালে হয়তো পাইথনের হিংস্র চোখ জেগে আছে অসতর্ক দুর্ভাগা শিকারের প্রতীক্ষায়।

আর জঙ্গলের মধ্যে জেগে আছে হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও হিংস্র একদল মানুষ।

শালপাতার ফাঁক দিয়ে হয়তো স্বপ্নের মতো মিষ্টি জ্যোৎস্না ঝিলিক দিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তীব্রতর আগুনের আলোয় সে জ্যোৎস্না হারিয়ে গেছে। একরাশ কাঠ-কুটো জেলে নিশীথ-সভার আয়োজন করেছে কুলিরা। লাল আগুন ওদের কালো মুখগুলোকে বিচিত্রভাবে রাঙিয়ে দিয়েছে—যেন যজ্ঞাগ্নির কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে কতগুলো অগ্নিময় পুরুষ—দ্রুপদের হোম হুতাশন থেকে প্রতিহিংসামূর্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের দল।

ছবির মতো সবাই নীরব হয়ে আছে।

—ঝং - ঝং—

স্তব্ধ বনভূমিকে চকিত করে দূরে কোথায় পাহাড়ীদের 'ঝাঁকড়ী' বেজে

উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মানুষগুলো, নড়েচড়ে বসল একবার। তারপর কথা বললে হীরালাল।

হীরালাল। কুলিদের সর্দার। তিরিশ বছর চাকরী করছে এই বাগানে, পনেরো বছর ভুগেছে ম্যালেরিয়ায়—পাঁচ বছর কালাজ্বরে। আর দীর্ঘ তিরিশ বছর বুকের রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়ে বাড়িয়েছে বিলিতী মালিকের লোভের পুঁজি। তারপর আজ বছরখানেক ধরে বুকের ভেতরে বাসা বেঁধেছে মরণ কীট,—যক্ষ্মা। তিরিশ বছর একনিষ্ঠ সেবার পুরস্কার। নিঃশব্দে দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর পথে।

কিন্তু মরবার আগে জ্বলে উঠতে চায় একবার। দেখে যেতে চায় নতুন যুগের গোড়া পত্তনি। এতদিন শুধু দিয়েই এসেছে—ফিরে পাওয়ার যে লগ্নটা এল তার পদধ্বনি একবার অনুভব করে নিতে চায় নিজের মধ্যে। অন্ধকারের শেষ পৈঠায় পা দিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখে নিতে চায় আকাশে সূর্য উঠেছে।

হীরালাল ডাকলে, মংরু, ডোমন'

ডাকটা এ'বারে বেজে উঠল গমগম করে। কঠিন, গম্ভী' গলা, পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ীর শব্দ ছাপিয়েও যেন তার ডাক বনের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে পড়ল। মাথার ওপরে শালের ডালে ঝট্‌পট্‌ করে পাখা ঝাড়া দিলে একটা ঘুমন্ত পাখী।

বলিষ্ঠদেহ দুজন উঠে দাঁড়ালো। একজন সাঁওতাল আর একজন ওঁরাওঁ। নতুন আমদানী, চা বাগানের বিষ এখনো ওদের রক্তে ক্রিয়া করেনি। আগুনের আলোয় ওদের চোখে প্রতিহিংসারূপী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রেতচ্ছায়া।

—ঠিক আছে। এখন বৈঠ যাও। বিচার হবে।

নীরবে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নিরুত্তরেই বসে পড়ল।

—তোমরা তার মেরেছিলে?

—হাঁ।

—কে মারতে বলেছিল ?

—পঞ্চায়েত।

আবার শুব্ধতা। শুধু সামনের আগুনটা পাতা পোড়ানোর একটা বিচিত্র শব্দ করে জ্বলে যেতে লাগল। আর দূরে বাজতে লাগল পাহাড়ীদের ঝাঁকড়ী —ওরা ভূত তাড়াচ্ছে, রবার্টসদের প্রেতাত্মাগুলোকেই হয়তো।

—কে কে ছিল পঞ্চায়েতে ?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন উঠে দাঁড়ালো। দুজন বুড়ো, তিনজন আধবুড়ো। সব চাইতে যে বুড়ো তার নাম তুলীরাম। কয়েক বছর আগে তুলীরামের ছেলেকে ইলেকট্রিক ডায়নামোর বেল্ট ভেতরে টেনে নিয়েছিল, রক্তাক্ত টুকরো কয়েক মাংস ছাড়া তার আর কিছু পাওয়া যায়নি। অনেক কায়দা-কানুন করে কোম্পানী পুলিশের হাঙ্গামা এড়িয়েছিল, আর তুলীরামের ক্ষতি-পূরণ মিলেছিল নগদ একশো টাকা। কিন্তু ক্ষতিপূরণে ক্ষত শুকোয়নি।

—এক, দুই, তিন হীরালাল গুণতে লাগল : মোট সাত। সাতজন বরবাদ।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে একটা চরম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

হীরালাল চারদিকে তাকিয়ে নিলে একবার। শুভ্র ভ্রূরেখাটা আবর্তিত হয়ে গেল বিচিত্র ভঙ্গিতে। বনের মধ্যে এতক্ষণে একটু একটু হাওয়া দিয়েছে, পোড়া পাতাগুলো উড়তে লাগল, আগুনের একটা দীর্ঘ শিখা বেঁকে গিয়ে হীরালালের মুখটাকে যেন আরো বেশি করে রক্তাভ করে তুলল। হীরালাল বললে, পঞ্চায়েতের ভুল হয়েছিল। ব্যানার্জি বাবু কি কোনদিন তোমাদের বলেছিল মানুষ খুন করতে ?

সবাই নড়ে চড়ে উঠল, কেউ কথা বললে না।

—একটা-দুটো মানুষকে খুন করে দাবী মেটে না, ওতে নিজেদেরই খুন ঝরে যায়, নিজেদেরই দুবলা করে ফেলে। আমি জ্বর হয়ে পড়ে ছিলাম, সেই ফাঁকে তোমরা এ কাজ করে ফেলেছ। কী লাভ হল এতে?

নির্বাক সভার ওপর একটা তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হীরালালই বললে, কারো লাভ হল না। মাঝখান থেকে পুলিশ এসে হাত বাড়ালো, বাবুরা বিনা দোষে জেলে চলে গেল। তোমাদের কাজ পেছিয়ে গেল দশ বছর। এর জন্যে দায়ী কে?

দায়ী কে, তা সবাই জানে। তাদের উত্তর এত স্পষ্ট যে ভাষা দিয়ে তা বোঝাবার দরকার নেই। নীরবে নিজেদের অপরাধ তারা কবুল করে নিয়েছে।

হীরালাল বললে, এক—দুই—তিন—সাতজন আবার দাঁড়াও।

সাতজন ফের উঠে দাঁড়ালো।

—তোমরা ক্ষতি করেছ কাজের। ক্ষতি করেছ সমস্ত মজুরদের, ক্ষতি করেছ দুনিয়ার যত গরীব পরিবারের! এর সাজা তোমাদের নিতে হবে।

অপরাধী সাতজন ছাড়া বাকী মানুষগুলো এককণ্ঠে সাড়া দিলে এইবার: আলবৎ!

—তা হলে সকলে একমত?

সমস্ত অরণ্য মুখর করে আবার সাড়া উঠল: আলবৎ।

—তোমরা—তোমরা সাতজন শোনো। আজ রাতেই সব হেঁটে সদরে চলে যাও। কবুল করো দোষ, বলো আমরা সাহেবকে খুন করেছি। কী বলো আর সবাই?

—আলবৎ

—কেউ বেইমানি কোরো না, কেউ পালিয়ো না। হয়তো মরতে হবে, হয়তো ফাঁস হবে তোমাদের। কিন্তু তোমরা মরলে তাতে দুনিয়ার মানুষের

আরো বেশি লাভ হবে। এক আধটা দুশমন নয়—সব দুশমনের জান নেবার জন্যে হাতে হাতিয়ার তৈরী হবে তাদের। যাও—আজ রাতেই সব সদরে চলে যাও—

সভায় চাঞ্চল্য দেখা দিল, কিন্তু অপরাধীরা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো নিস্তব্ধ। সামনের আগুনটা এতক্ষণে প্রায় নিবে এনেছে, এতক্ষণে শালের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে ওদের চোখেমুখে। প্রতিহিংসা-কঠোর অগ্নিমূর্তিগুলো ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নায় অকস্মাৎ যেন বিচিত্র কোমল আর করুণ হয়ে গেছে।

—উঁ—উঁ

কঠিন সংযম সত্ত্বেও একটা চাপা কান্নার গোঙানি ডোমনের বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, সামনে অফুরন্ত জীবনের আশা—রক্তে রক্তে উদ্বেলিত যৌবন। কদিন আগেই সাঙ্গা হয়েছে তার—প্রথম প্রেম, প্রথম মিলনের নেশা এখনো তার চেতনার ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে। তার ফাঁস হয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে সমস্ত—মিটে যাবে জীবন?

অসহায় হাহাকারটা চাপা কান্না হয়ে বেরিয়ে এল: উঁ—উঁ—

—চুপ—বাজের মতো গর্জে উঠল হীরালাল: কাঁদে কে—কোন্ শূয়োরের বাচ্চা? মরতে যে ডর করে, মারতে তার হাত ওঠে কেন? সে পুরুষ না মেয়ে মানুষ?

তিরিশ জোড়া চোখ পলকে ডোমনের ওপরে গিয়ে পড়েছে। তিরিশ জোড়া চোখে শুধুই ঘৃণা—অমানুষিক ঘৃণা—যে ঘৃণা দিয়ে তারা দেখতে রবার্টসকে, যাদব ডাক্তারকে। কোনখানে একবিন্দু সহানুভূতি নেই, এতটুকু আশ্বাসও নেই।

দাঁতে দাঁতে চেপে নিজেকে সামলে নিলে ডোমন। মথা ঘুরছে—চোখের সামনে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে ডুকরে উঠছে কান্নার উচ্ছ্বাস।

ফাঁস হয়ে তার—সে মরে যাবে! পৃথিবীতে দুঃখ আছে—অপমান আছে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আছে চাঁদ, আছে শাল ফুলের গন্ধ, আছে বাঁশি, আর—

কিন্তু উপায় নেই। এ বিচার। এর নির্ধারণ মৃত্যুর মতো নির্ভুল।

শুকনো পাতা পড়ে সম্মুখের আগুনটা আবার জ্বলে উঠেছে দপ দপ করে। কালো মূর্তিগুলোর গায়ে আবার ছড়িয়ে পড়েছে সেই আশ্চর্য আগ্নেয় রক্তাভা। আর হীরালাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডোমনের দিকে—গলা দিয়ে তার একটা শব্দ বেরুলে বাঘের মতো যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে!···

.. ...শালবনের মধ্যে রাত ঘনিয়েছে, আরো নিবিড়, আরো নিঃশব্দ। পাতায় পাতায় চলেছে বাতাসের কানাকানি, কুহেলিগ্রস্ত জ্যোৎস্না জঙ্গলের মধ্যে আঁকছে অপরূপ পত্রলেখা।

আর আলো আঁধারির বনপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাতজন। স্থির, অকম্পিত, সুনিশ্চিত। ওদের মধ্যে ডোমনকে চেনা যাচ্ছে না। তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না তার পা কাঁপছে কিনা, তার চোখে ছড়িয়ে আছে কিনা অপমৃত্যুর আতঙ্ক। অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে।

কিন্তু ওরা জানে: ওই ফাঁসিকাঠ চিরদিন থাকবে না। অনেক পাপ, অনেক মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টস্‌রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওদের সাতজনের মৃত্যুর পেছনে জেগে উঠবে সাত হাজার—সাত লক্ষ—সাত কোটি—সংখ্যাতীত, গণনাতীত জীবন। ওই ফাঁসিকাঠে সেদিন মানুষের রক্ত ফুল হয়ে ফুটে উঠবে—সে ফুল অহিংসার, সে ফুল মৈত্রীর—সে ফুল কল্যাণের।

পনেরো

'কল' থেকে ফিরে মণিকাদি দেখলে, অনিমেষ আর সুমিতা তখনো বসে বসে নিশ্চিন্তে গল্প করছে।

হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মণিকা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, সুমি, অনিমেষকে খেতে দিসনি এখনো?

—খায়নি। তুমি এলে এক সঙ্গেই খাবে বলেছে।

মণিকা চটে উঠল: কেন? এক সঙ্গে কেন? বেলা কটা বেজেছে খেয়াল আছে? রোগীকে এতক্ষণ না খাইয়ে রাখলি, তুই ভয়ানক ইরেস্‌পন্‌সিবল সুমি।

অনিমেষ হাসল, খামোখা বেচারাকে বকছ মণিকাদি। ওর দোষ নেই।

—না, কারো দোষ নেই। তুই এখন ওঠ্ তো সুমি। চটপট গরম জল নিয়ে আয় অনিমেষের। ঝিটা বাজার করে দিয়ে যায়নি বুঝি এবেলা? নাঃ—সবাই মিলে হাড় জ্বালিয়ে দিলে আমার।

নতুন গৃহিণীর সংসার পাতবার মতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে মণিকা। নতুন সংসার বইকি। চিরকাল কেটেছে নিজের সংক্ষিপ্ত গণ্ডিরেখার মধ্যে, বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ জীবন-যাত্রার ভেতরে। খসরুর চিরন্তন রান্না, হাসপাতাল, ডিউটি, রোগী দেখে বেড়ানো। বাড়ি ফিরে এক একদিন নিজেকে কেমন অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন বলে মনে হয়েছে। বঞ্চিত মাতৃত্ব আর রিক্ত নারীত্ব জীবনযুদ্ধের কঠিন বর্মটার তলায় রক্তটাকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলেছে, ঘুমভাঙা নিশীথ রাত্রে নির্জন নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারটার মতো নিজেকেও অস্বাভাবিক শূন্য বলে বোধ হয়েছে।

আজ অনিমেষ একান্তভাবে তারই আশ্রয়ে এসেছে। আর তার দেখা-শোনা করতে এসেছে সুমিতা। হঠাৎ যেন সব পূর্ণ হয়ে গেছে। মণিকাদির কল্পকামনা এক ধরণের পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে, যেন এতদিন পরে সংসার বেঁধেছে সে।

খাওয়ার টেবিলে বসে মণিকা বললে, নাঃ—এতে চলবে না। আমি বিকেলে নিজেই বেরুব, বাজার করে আনব। অনিমেষের এখন ভালো নিউট্রিশন দরকার।

অনিমেষ ছোট্ট করে হাসল: কিন্তু আজ বিকেলে আমি চলে যেতে চাই মণিকাদি।

—সে কি!—মণিকা আর সুমিতা দুজনেই এক সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

জোর করে হাসবার চেষ্টা করলে মণিকা: পাগল, এখন এই শরীর নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কে তোমাকে? বাড়ির বাইরে তোমাকে এক পা বেরুতে দেওয়া হবে না।

—থাকতে চাইলেই কি থাকতে পারি মণিকাদি? আমার ইচ্ছেতেই কি সব?

—কেন, কে তোমায় টানছে? কী তোমার এত তাড়া?

—আর যে সময় নেই।

—কেন?

অনিমেষ তেমনি ছোট করে হাসল, জবাব দিল না। সে হাসি সংক্ষিপ্ত, তার অর্থও সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ কোনোমতেই তাকে রাখা যাবে না। বাইরের ডাকে আজ সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ধরবার ক্ষমতা কারো নেই। মণিকার স্নেহেরও নয়, সুমিতার প্রেমেরও নয়।

সুমিতার মুখের ভাত মুহূর্তে তেতো হয়ে গেছে। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—গার্ডেন। রংঝোরা চা-বাগানে।

—চা-বাগানে!

—হুঁ। পালিয়ে এসে ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না। ধরমবীর কী করছে না করছে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি। ওটাও এক পাগল—যা তা করতে পারে। কিন্তু এখন আর আমার থাকা চলে না—ফিরে যেতেই হবে।

—কিন্তু পুলিস—

অনিমেষ হাসল: পুলিস আর কী করবে? ওদের হাঙ্গামাকে ভয় করি না, ভয় করি নিজের মনের অপরাধকে। কোনো দোষ করিনি, কোনো অন্যায় করিনি—কেন পালিয়ে আসব চোরের মতো, খুনীর মতো? বরং যারা খুন করেছে, তাদের এখনি এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার; তাদের বোঝানো দরকার, শক্তিকে অপচয় করবার কোনো সার্থকতা নেই, আসন্ন আগামী বিপ্লবের জন্যে তাকে সংহত করতে হবে।

—কিন্তু এই শরীরে—

—ও কিছু না, দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠব। অত সহজে মরলে কি আমাদের চলে?—প্রসন্ন হাসিতে অনিমেষের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: ইংরেজের দৈত্যকুলে আমরা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু গণনৃসিংহের হাতে না মরা পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু নেই।

মেয়েরা দুজনেই চুপ করে রইল। একজনের দৃষ্টি হতাশায় ম্লান, আর একজনের মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। প্লেটের ভাত কারও আর মুখে উঠছে না।

—তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা এই, অবিলম্বে আদিত্যদার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অকারণে হয়রাণ হতে হচ্ছে বেচারাকে। আমি না গেলে

কিছুই করা চলবে না। আর আদিত্যদা ফিরে না এলে এদিকের কাজকর্ম সব পণ্ড!

এ যুক্তির কোনো প্রতিবাদ নেই। একটা আকস্মিক তিক্ততায় ভরে উঠল মণিকার মন। বৃথা—বৃথা। এদের নিয়ে দুদিনের জন্যেও নিজেকে পূর্ণ করে তোলবার কল্পনা অর্থহীন। এদের রক্তে রক্তে ঝড়ের রাত্রির ফেনায়িত সমুদ্রের আহ্বান। সেই মাতাল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে এরা উদয়-তাগের পথে নৌকো ভাসিয়েছে। হয় ভরাডুবি হবে, অথবা কোনো একদিন, কে জানে কবে—সার্থকতার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে।

আর সুমিতা ভাবছিল: এক রাত্রির মোহ—এক রাত্রির স্বপ্ন। প্রথম এবং শেষ বাসর। তার মাথাটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল অনিমেষ, সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনের চরম সার্থকতা এসেছিল আকস্মিকভাবে, আকস্মিকভাবেই ঘটল তার শেষ পরিণতি। ক্ষণিকের জন্যে লোভ এসেছিল, ক্ষণিকের জন্য এসেছিল দুর্বলতা। কিন্তু নিজের হাতেই অনিমেষ শেষ করে দিলে তাকে, তার বিস্মৃতি-জাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। তিন বছর আগে যেমন করে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল একদিন। সেদিন মন ছিল কাঁচা, সেদিনের স্বপ্নভঙ্গ বেজেছিল অত্যন্ত নির্মমভাবে, বুকের ক্ষতচিহ্ন থেকে অনেক রক্ত ঝরে পড়েছিল। কিন্তু আজ আর সে দুর্বলতা নেই; পথ চলতে নেমে অনেক কঠোর হয়ে গেছে—নিজের সীমার ওপারে মহাজীবনের নির্দেশ—আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে সর্বময় মানবতার নির্দেশ পেয়েছে সে। তবু একটি রাত্রির ফুল—একটি রাত্রির মাদকতা। বন্ধুর পথে চলতে চলতে যখন নিজের ভেতরে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসবে, সেদিন এই ফুলের গন্ধ, এই মাদকতার মাধুরী তাকে প্রাণ দেবে।

সুমিতা মৃদুকণ্ঠে বললে, আজকেই যাওয়া দরকার?

—হ্যাঁ, আজই।

মণিকাদি কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। বাইরে দরজায় সজোরে কড়া নাড়ছে কে যেন। এমনভাবে কড়া নাড়ছে, যেন ভেঙে ফেলবে।

পুলিস নয় তো! মুহূর্তে রক্তহীন হয়ে গেল সুমিতা আর মণিকার মুখ। প্রায় আর্তকণ্ঠে মণিকা চীৎকার করে উঠল : কে?

—আমি বিকাশ। সুমিতাদি আছে?

বিকাশ। দলের ছেলে। সুমিতা ভাত ফেলে উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে, জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে?

—সাংঘাতিক ব্যাপার সুমিতাদি।

—কী হল?

—এশিয়াটিক আয়রণে স্ট্রাইকারদের এপর গুলি চলছে।

গুলি চলছে। মুহূর্তে ইঙ্গিতময় স্তব্ধতায় ভরে গেল সব। মণিকা তাকিয়ে রইল বিহ্বল দৃষ্টিতে, সাগ্রহ উত্তেজনায় অনিমেষের চোখ জ্বলতে লাগল।

সংশয়গ্রস্ত ক্ষীণ গলায় সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের কোনো ছেলে—

—হ্যাঁ, ইন্দুর বুকে লেগেছে একটা—

ইন্দু! কবি ইন্দু! সুমিতার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরুল শুধু।

মুহূর্তে টেবিল থেকে উঠে এল অনিমেষ। চোখে আগুন; বিকাশকে বললে, চলো।

অনিমেষকে দেখে বিকাশ চমকে উঠল।—অনিমেষ-দা! আপনি এখানে?

—হ্যাঁ, আমি এখানে। সে সব কথা পরে হবে। এখন চলো। ইন্দু বাঁচবে তো?

—বলা যায় না—

—চলো, চলো—

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মণিকাদি দেখলে কেউ নেই। বিকাশ নেই, অনিমেষ নেই, সুমিতাও নেই। যেমন ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

মণিকা পাথরের মতো বসে রইল টেবিলে। অনিমেষ আর সুমিতার অর্ধভুক্ত প্লেটের দিকে তাকিয়ে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। তারপর টপ টপ করে চোখের জল ঝরে যেতে লাগল নিজের প্লেটটার ওপরে।

না, সত্যিই যুদ্ধ বেধেছে কলকাতায়। আর থাকা চলে না। মণিকা এবার কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবে—যেখানে হয়, যতদূরে হয় দৃষ্টির সামনে সমস্ত কলকাতা শূন্য আর ঝাপসা হয়ে গেছে।

*   *   *   *   *

আসামীরা একরার করেছে এসে। ধরমবীর আর আদিত্য খালাস পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। জেল থেকে বেরিয়েই কলকাতায় ফিরেছে আদিত্য।

লক্ষ্যহীনের মতো পথ দিয়ে চলতে লাগল সে। ক'দিনের একটা ঘূর্ণি ঝড়েই সমস্ত আয়োজনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এশিয়াটিক আয়রণে গুলি চলবার পরের দিনই সুমিতার চারতলা বাড়িব সংসারে নজর নিয়েছিল পুলিশ। অনেককে ধর-পাকড় করেছে, বাকী সব আবার কোন্ অন্ধকারের মধ্যে ছিটকে পড়েছে, তার ঠিকানা নেই। আবার তাদের খুঁজে বার করতে হবে, আবার কাজ শুরু করতে হবে নতুন করে।

অনিমেষ, সুমিতা জেলে। ইন্দু হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। কবি ইন্দু! ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চারতলা শূন্য বাড়িটার দিকে আদিত্য একবার তাকালো। গোটা দুই শক্ত শক্ত তালা ঝুলছে লোহার গেটে। কে তালা দিয়েছে কে জানে—বোধ হয় পুলিস।

এখন আদিত্য একা। তা হোক। একদিন যেমন করে নিয়েছিল, আজও আবার তেমনি করে সব গুছিয়ে, সব সাজিয়ে নিতে হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে দলটাকে 'ব্যান্' করেনি বটে, কিন্তু আঘাত দিচ্ছে যেখানে সুযোগ, যেখানে অবকাশ। দেশের একদল মানুষও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগার জন্যে সাধারণের মধ্যে অপ্রীতির সঞ্চারও হয়েছে খানিকটা।

কিন্তু কিছুই করবার উপায় নেই। যুক্তির প্রশ্ন, বিচারের প্রশ্ন। এখানে ভুল করলে চলবে না।

বাগানে গিয়ে কিছুই করতে পারেনি। পেলনা অনিমেষকে, অনর্থক হাজত থেকে ঘুরে এল দিনকয়েক। তবুও মস্ত বড একটা লাভ হয়েছে। দেখে এল কলকাতায় বসে ভাবা তাদের বিপ্লব কী ভাবে দেশের অজ্ঞাততর মনলোকে গিয়ে পৌঁছেছে।

ধরা দিয়েছে খুনীরা, কিন্তু সেই সঙ্গে পথের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল নতুনদের জন্যে। জানা গেল, আজ আর ওদের বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে হবে না, বিপ্লব তার নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে।

একবার থেমে দাঁড়িয়েই চলতে শুরু করেছিল আদিত্য, হঠাৎ হাওয়ায় একটুকরো ছেঁড়া কাগজ এসে তার জুতোর সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। কী মনে করে কাগজখানাকে তুলে নিলে সে।

কবি ইন্দুর কবিতার একটা ছেঁড়া পাতা। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। অনেকগুলো অক্ষর একেবারে ধুয়ে গেছে। তবু দুটো লাইন পরিষ্কার পড়া যায় এখনো :

ছেঁড়া তারে ঘেরা ভাঙা-ট্রেঞ্চের মলিন অন্ধকারে

মৃত সৈনিক উষার স্বপ্ন দেখে।

মাথার ওপরে কর্কশ ধ্বনিতে বিমান উড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ। গণতন্ত্রের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। ভারতের শৃঙ্খলিত বুকের ওপরে ট্যাঙ্কের চাকা কেটে কেটে বসে যাচ্ছে—স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র আসছে বইকি। কিন্তু এ যুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধে তার প্রস্তুতি মাত্র।

সে প্রস্তুতি শুধু মধ্যবিত্ত মানসের সত্তায় নয়, নয় একমাত্র শহরের কলে-কারখানায়। সর্বহারার রক্তে রক্তে বায়ুচর বীজাণুর মতো তা আপনা থেকেই প্রসারিত হয়ে গেছে। এমন দিনও হয়তো আসবে যেদিন এর

ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ওরাও ভয় পাবে, যেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠবে—এর প্রচণ্ড অগ্রগতির পথে ওরাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন আর ডোমনদের ফাঁসির দড়ি নিতে হবেনা, ওদের গলায় পড়বে মালা, ওদের আত্মহারা আত্মঘাত দেখা দেবে সর্বব্যাপী মারণ-যজ্ঞে। আজ যারা প্রাণ দিল ফাঁসিতে, বুকের মধ্যে বুলেটের ঘা বয়ে, তাদের দীপ্তিময় ঘষা চোখগুলি বিপ্লবের রক্ত-প্রদীপ হয়ে জ্বলতে থাকবে দিকে দিকে। তার মধ্যে শেষ হয়ে যাক যুদ্ধ, শেষ হয়ে যাক এই প্রায়শ্চিত্তের পালা।

ধরমবীরের বলার মধ্যে কিছু সত্যও আছে। শুধু যুক্তি নয়, ইমোশনও চাই। এমন শক্তি চাই যে মহাত্মা গান্ধীর নামের মতো দেশের লক্ষ কোটি প্রাণে তা তুফান জাগিয়ে তুলবে। তাকে পেলেই সহজ হয়ে যাবে কাজ, সফল হবে মৃত-সৈনিকদের কাছে অঙ্গীকার।

উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মতো তীব্র দৃষ্টিতে সন্ধ্যার কালো আকাশের দিকে তাকালো আদিত্য। মৃত-সৈনিকের চোখে উষার স্বপ্ন। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ-শিখর থেকে সাগর-প্রান্তের কলকাতা পর্যন্ত—আসমুদ্র-হিমালয় সূর্য-সারথির রথচক্রে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে।